নজরুল ও মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন ঃ সওগাত সম্পাদক

নজরুলের সাহিত্য ও ব্যক্তিগত জীবনে 'সওগাত' সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিনের প্রভাব ছিল অসামান্য। কমরেড মুজফ্ফর আহমদের মতই তিনি নজরুলের প্রতিভাকে প্রস্ফুটিত করে তুলেছিলেন। বলতে কি, নজরুল প্রতিভার বিকাশ ও সাফল্যের পেছনে 'সওগাত' এক দারুণ উজ্জীবনী শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। মুজফ্ফর আহমদের মতই মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন কবি নজরুলকে আগলে রেখেছিলেন। নজরুলের মৃত্যুর পর মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, দসওগাত-যুগে নজরুল ইসলাম নামে এক অসাধারণ গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই গ্রন্থে নজরুলের জীবন ও কর্মের এক ঐতিহাসিক দলিল রয়েছে। নজরুলের প্রথম মুদ্রিত প্রবন্ধ ও গান 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। নজরুলের দ্বিতীয় গল্প 'স্বামী হারা' প্রকাশিত হয় 'সওগাত পত্রিকায় ১৩২৬ সালের ভাদ্র মাসে। প্রথম বর্ষ, ১০ সংখ্যা। প্রথম দিকে নজরুলের কবিতা 'সওগাত' পত্রিকায় ছাপা হয়নি। এতে নজরুল দারুণ ক্ষুব্ধ হন। অতঃপর একটি অসাধারণ ব্যঙ্গ কবিতা লিখে তা পাঠিয়ে দেন 'সওগাত' পত্রিকার সম্পাদকের কাছে। এ সময় নজরুল হাবিলদার হিসেবে করাচীতে বাঙ্গালী পল্টনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক ছিল না। অতঃপর মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন চমৎকারভাবে 'সওগাত'-এর সঙ্গে নজরুলের সেই প্রথম সম্পর্কের ইতিহাস তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।

নাসিরউদ্দীন লিখেছেন বিশ্বযুদ্ধ অবসানে নজরুল দেশে ফিরে আসেন। কলকাতায় এসে প্রথমে তিনি উঠেছিলেন বন্ধু শৈলজানন্দের মেসে। সেখানে দু'একদিন কাটিয়ে সোজা চলে আসেন 'সওগাত' অফিসে। এটাই ছিল নজরুলের প্রথম 'সওগাত' এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। নাসিরউদ্দীন সাহেব লিখেছেন: 'আমি অফিসে বসে কাজ করছি, এমন সময় সৈনিকের পোষাক পরিহিত এক যুবক আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমি তাঁকে প্রথমে দেখে চমকে উঠলাম। ভাবলাম মিলিটারীর লোক কেন আবার আমার অফিসে এসে ঢুকলো? যুবক হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর বল্লেন, আমি কাজী নজরুল ইসলাম। বাঙালী পল্টন ভেঙে দিয়েছে, তাই করাচী ছেড়ে চলে এলাম। আপনি 'সওগাতে' আমার প্রথম লেখে ছেপেছেন সে কথা ভুলিনি। সকলের আগে আপনার সঙ্গেই দেখা করার ইচ্ছে হলো।'

এর আগে নজরুলকে কোনদিন দেখি নি। তাঁর বলিষ্ঠ তেজাদীপ্ত চেহারা। তার উপর সৈনিকের পোষাক, আমি অবাক বিস্ময়ে দেখলাম তাঁকে। লক্ষ্য করলাম, তিনি বড় চঞ্চল প্রকৃতি। চোখে-মুখে দারুণ চঞ্চলতা। এক সঙ্গে অনেক কথা বলতে চান। এক একটা কথা বলেন আর অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন। তাঁর সেই উদাত্ত হাসিতে ঘর কেঁপে ওঠে। কোন জড়তা নেই– কোন দ্বিধা নেই তাঁর মধ্যে। ক্ষণিকের মধ্যেই জমে উঠলো ঘনিষ্ঠতা। বল্লাম: চা না খেয়ে যেতে পারবেন না। তিনি আপত্তি করলেন না, বরং বল্লেন, পান-জর্দাও আনাবেন।"

চা খাওয়ার সময় নজরুল প্রথমেই বল্লেন: মুসলমান সমাজে ছবিসহ আধুনিক ধরনের পত্রিকা বের করে আর আমাদেরকে স্বাধীনভাবে লিখবার সুযোগ দিয়ে আপনি মহৎ কাজ করলেন। 'সওগাতে'র মাধ্যমেই আমাদের ভবিষ্যৎ নূতন সাহিত্য গড়ে উঠবে।

আমি বল্লাম : কিন্তু কুসংস্কারের আচ্ছন্ন আমাদের মোল্লা-রাজ্যে এ কাগজের পরিণতি কি হবে জানি না।

নজরুল বল্লেন : কোন চিন্তা করবেন না। সমাজের চিন্তাশীল যুবকরা আপনার সদয় হবে– এ আমি জোর দিয়ে বলতে পারি।

আমিও এক সময় কাঠমোল্লা ছিলাম। আমাকে দেখে হয়ত বিশ্বাস করবেন না যে ছোটবেলায় আমি মক্তবের ছাত্র ছিলাম। আর মক্তবের ছাত্রদের মধ্যে আমিই ছিলাম মৌলভী সাহেবের সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র। সুর করে চমৎকবার আরবী পড়তে পারতাম। অল্প বয়সে মোল্লাগিরী করে গ্রামে আমার বেশ সুনাম হয়েছিল। এমনকি পীরের মাজারে খাদিমগিরি আর মসজিদে ইমামতিও করতে পেরেছিলাম সেই বয়সেই।

আমি জিজ্ঞেস করলাম ; এমন একজন পাকা মোল্লাজী এমন আধুনিক যুবকে পরিণত হলেন কেমন করে ?

নজরুল বল্লেন ঃ ধরা–বাঁধা অবোধ্যবুলি আওড়াতে আওড়াতে অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত ওসব ছেড়ে ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেলাম পল্লীগীতির রাজ্যে। সেখানে পেলাম আনন্দ। সেই থেকেই চলেছি মুক্ত পাখির্ মতো স্বাধীন ভাবে। মন যা চায় লিখতে আরম্ভ করি। লিখেছি কবিগান, যাত্রাগান, লেটোর দলের গান, সাথে সাথে নেচেছি, অভিনয় করেছি– কোনটাই বাদ দেই নি।

আবার সেই প্রাণখোলা অট্টহাসিতে গোটা ঘর কেঁপে উঠলো।

আমি উৎসুক্য নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম : আপনার সেই ছেলেবেলার লেখা গুলি না জানি কেমন। ছিল !

নজরুল হো হো করে হেসে বল্লেন, পেটে বিদ্যার অভাবে তখনকার লেখাগুলো বিশুদ্ধ ভাষা হয়নি।

আর সেই বারো তেরো বছর বয়েসে কি-ইবা এমন লিখতে পারতাম। লেখাপড়া করবার মতলবে ওসব ছেড়ে চলে গেলাম অন্যত্র। কিন্তু ক্লাসে একটানা অতক্ষণ বসে থাকা আর স্কুলের পাঠ্যবই আওড়ানো আমার যেন ছিল অসহ্য। তবে বাইরের কবিতা, গল্প, নাটক পেলে মন দিয়ে পড়তাম। স্কুলের নিয়ম মতো পড়া আমার মোটেই ভালো লাগতো না। সেনা দলে লোক নেবে শুনে তাই পালিয়ে গেলাম দেশ ছেড়ে। যুদ্ধে যেয়ে মনটা তাজা আর উন্মত্ত হয়েছে। এখন হয়তো লিখতে পারবো। দোয়া করবেন। হ্যাঁ, আমার কথা তো অনেক বল্লাম। এবার 'সওগাতে'র কথা বলুন! নজরুল একটানা কথাগুলো বলে গেলেন।

আমি বল্লাম ঃ আমাদের সাহিত্য ও সমাজ এখন কোন স্তরে আছে তা আপনার অজানা নয়। ছবি দিয়ে আধুনিক ধরনের কাগজ বের করার যে অনেক বাধা-বিপত্তি আছে, তা ভালোভাবেই অনুভব করছি। তবে প্রগতিশীল সাহিত্য পত্রিকা পরিচালনার কাজে তরুণ সমাজের সহযোগিতাই আমার বিশেষ ভরসা।

এরপর আমি জিজ্ঞেস করলাম : কোলকাতায় থাকবেন কোথায় ?

নজরুল বললেন ঃ আমাকে নিয়ে দু'তিন জায়গায় টানাটানি চলছে। হিন্দু বন্ধুরা বলছেন তাদের সাথে থাকতে আর মুসলমান বন্ধুরা বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির ওখানে থাকতে অনুরোধ করছেন। গতবার এসে এখানেই গিয়েছিলাম। ওরা সকলেই আমাকে বলে রেখেছেন। ফিরে এসে যেন ওখানে ছাড়া আর কোথাও না যাই। তাই সাহিত্য সমিতির' অফিসেই থাকবো মনে করেছি। এখন অবসর আছে, অনেক লিখবো ---------- অনেক লেখা দেবো 'সওগাতে'।

আবার হেসে উঠলেন তিনি। তাঁর লেখা তখনো কাঁচা। তাই তাঁর লেখা পাবার জন্যে তখন বিশেষ আগ্রহ দেখালাম না। কারণ এর আগে অনেক লেখাইতো তাঁর সওগাতেরই জন্য মনোনীত হয় নি। নজরুল যে একদিন এত বড় কবি হবেন, সেদিন তা মনে আসি নি। তাহলে সেইসব অপ্রকাশিত লেখা রেখে দিলে আজকার দিনে সেগুলি গবেষণার বিষয় হতো। তাঁর প্রথম জীবনের উচ্ছ্বাসে ভরা প্রকাশ ব্যাকুলতার সঙ্গে আজকের সাহিত্যিক সমাজের পরিচয় ঘটতো। কিন্তু সে শুধু জড়িয়ে থাকলো আমার স্মৃতিতে– আর কাউকে তার অংশীদার করা গেল না। সেদিন সেই হাস্যমুখর চিরচঞ্চল বলিষ্ঠ দেহ যুবক বারবার ধন্যবাদ জানিয়ে আসন ত্যাগ করে আমার কাছ থেকে বিদায় নিলেন।" (মোহাম্মাদ নাসিরউদ্দীন, সওগত যুগে নজরুল ইসলাম, ঢাকা ১৯৮৮ পৃ. ৪১-৪৪)

মুজফ্ফর আহমদের লেখা থেকে নজরুলের সৈনিক জীবনের শেষে নতুন ভাবে জীবন শুরুর কথা জানতে পারি আমরা। নজরুলের পুরোন লেখার ব্যাপারে 'সওগাত' সম্পাদকের আফশোসের কথাও জানা হ'ল। নজরুলের বক্তব্যের মধ্যে তাঁর চরিত্রও ফুটে উঠেছে এখানে। তিনি সেকালে বড় কবি হবেন এমন প্রত্যয় ফুটে উঠেছে তাঁর

কণ্ঠে। তাঁর আবির্ভাব যে অনেকটা ঝড়ের মতো– এটাও বোঝা যায়। তাঁর চিরচঞ্চল হাসি মাখা মুখ' তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট ছিল। আজীবন এমনই ছিলেন তিনি। পরকে আপন করে নেবার ক্ষমতা ধারণ ক্ষমতা ছিল নজরুলের। তাঁর নিজের চরিত্রের মধ্যেই ছিল তিনি অন্যদের থেকে কত আলাদা, কত ব্যতিক্রমী। তবে সব কিছু ছাপিয়ে তাঁর জয় প্রত্যয় এবং আত্মবিশ্বাস, এগিয়ে যাবার বাসনাও কবি হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠা সব স্পষ্ট হয়ে ওঠে প্রথম থেকেই। 'সওগাতে'র সঙ্গে তাঁর মেলবন্ধন উভয়কেই সমৃদ্ধ করেছে। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন তা স্বীকার করেছেন।

এটাই নজরুল। আজীবন এমন আবেগী এবং খেয়ালী মনের মানুষ ছিলেন তিনি। এটাই ছিল তাঁর স্বভাব ধর্ম। সারা জীবন তা বদলায়নি। নাসিরউদ্দীন নজরুলের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকারের চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে। নজরুল নিজেই তাঁর ছেলেবেলার জীবনের কথা বলেছেন। বিচিত্র সে জীবন।

'সওগাত' সম্পাদক নাসিরউদ্দীনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে নজরুল তাঁর বাল্যজীবনের কথা বলেন এবং সে সময়ে তিনি মক্তবের ছাত্র ছিলেন এবং খুব ভাল সুর করে চমৎকার আরবী পড়তে পারতেন এবং মোল্লাগিরী করেও সুনামও অর্জন করেন। তিনি পীরের দরগায় খাদেমগিরি এবং মসজিদের ইমামতীও করেছেন। এ থেকে অনুমতি হয় যে বাল্যকালেই তিনি একজন ভালো মুসলমান ছিলেন এবং মানুষের ভালবাসাও অর্জন করেন তিনি।

অতঃপর একদিন পল্লীগীতির রাজ্যে চলে এলেন এবং কবিগান, যাত্রাগান এবং লেটোর দলের গানও তিনি রচনা করে প্রশংসা লাভ করেন। নজরুল গান লিখেই ক্ষান্ত হননি, এ সব রচনার পাশাপাশি তিনি নেচেছেন এবং গেয়েছেনও। নজরুল লেখা-পড়াতে ভাল ছিলেন। কিন্তু লেখাপড়ার বাইরে বিভিন্ন গল্প, কবিতা, নাটক মন দিয়ে পড়তেন। ইংরেজী ও ফারসী সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর বেশ ধারণা ছিল, বিশেষ করে হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধেও তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ছিল বিধায় কবিতা ও গানে তার প্রভাব আমরা প্রত্যক্ষ করি। কবিতা ও গানে তিনি হিন্দুশাস্ত্রের নানা শব্দ, উপমা ইত্যাদি প্রয়োগ করেছেন। এতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে হিন্দু ও ইসলাম সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট জানা-শোনা ছিল। যুদ্ধে যোগদান কালকে তিনি তাঁর জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায় হিসেবে গণ্য করেন। সৈনিক থাকাকালীন সময়ে তিনি রুশবিপ্লব সম্পর্কে অবহিত হন এবং ইংরেজদের এদেশকে শোষণ করতে দেখে তিনি প্রতিবাদী হন। ছেলেবেলা থেকেই তিনি বৃটিশ বিরোধী ছিলেন।

নজরুল 'সওগাত' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও পরবর্তীতে তিনি সাহিত্য ও সঙ্গীতচর্চার পাশাপাশি সাংবাদিকতাকে পেশা করে নেন এবং সে সময়ে তাঁর লেখা কবিতা, গান, গল্প ইত্যাদি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত ছাপা হয়েছে। এ সব পত্রিকার মধ্যে 'মোসলেমভারত', 'নবযুগ', 'সেবক' 'ধুমকেতু' 'লাঙ্গল' ইত্যাদিতে তিনি শুধু

লেখকই ছিলেন না, অনেকগুলিতে তিনি নিজেই সম্পাদক এবং সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেছেন। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন তার গ্রন্থে এসবের এক বিস্তারিত বিবরণও দিয়েছেন। তৎকালীন কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে নজরুলই ছিলেন সক্রিয় দেশপ্রেমী ও জাতীয়তাবাদী।

নজরুল শৈশব জীবন থেকেই দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত ছিলেন। 'কাজী পরিবার' হিসেবেও তাঁর পরিবার মর্যাদা সম্পন্ন হলেও আর্থিক দিক দিয়ে ছিলেন অসহায়। বাল্যকালে তাঁর নিজের বৃত্তির টাকা দিয়েও সংসার পরিচালনা করতে হয়েছে তাঁকে। অতঃপর সৈনিক জীবন থেকে ফিরে আসবার পর দারিদ্র্য এবং নানা সমস্যায় তিনি জর্জরিত হন। সাধারণ মানুষদের প্রতি বিত্তবান ও উচ্চবিত্তের মানুষদের শোষণ, নির্যাতন লক্ষ্য করে তিনি 'বিদ্রোহী' হয়ে ওঠেন। এ সবই তাঁর লেখনিতে প্রকাশ পেয়েছে। গোঁড়া হিন্দু ও মুসলিম সমাজকে তিনি তাঁর কাব্য ও সাহিত্যে দারুণভাবে সমালোচনা করেছেন। জনাব নাসিরুদ্দীন তাঁর গ্রন্থে এ সবের একজন্য প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন সম্পাদিত 'সওগাত' পত্রিকায় নজরুল নিজেকে তাঁর রচনার মাধ্যমে একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছিলেন। 'সওগাত' পত্রিকায় নজরুল সম্বন্ধে অনেক আলোচনা প্রকাশ পেয়েছে। এসব আলোচনায় নজরুলকে রবীন্দ্র পরবর্তীযুগের নূতন ধারার কবি, কিংবা 'যুগপ্রবর্তক কবি-প্রতিভা' হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন প্রমুখ নজরুলকে রবীন্দ্রযুগের এক অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন কবি হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। তাঁদের সে সব বক্তব্য এবং মন্তব্য 'সওগাত' পত্রিকায় পুস্তক সমালোচনা হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন 'সওগাত' পৌষ ১৩৩৩ সংখ্যায় নজরুল যুগ প্রবর্তক কবি হিসেবে আখ্যায়িত করে উল্লেখ করেন: 'যুগ প্রবর্তক প্রতিভার আকস্মিক সফল প্রকাশ ও অপূর্ব পরিপূর্ণতার স্বরূপ হৃদয়গ্রহ করিবার পক্ষে পাঠক-মনের পূর্ববর্তী যুগ প্রতিভার যে মোহমুক্তি দরকার, তাহা কিঞ্চিত সময়সাপেক্ষ। বিরাট রবীন্দ্র প্রতিভার মোহে বাঙ্গলার সাহিত্যিক মন আচ্ছন্ন। যদিও এই আচ্ছন্নতার মাঝখানে থাকিয়া সম্প্রতি একটি অস্বস্তির ভাব ও নূতনের জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা কোন কোন স্থানে জাগিয়া উঠিয়াছে, তথাপি আচ্ছন্নতার ভাব সম্পূর্ণরূপে কাটাইয়া উঠিতে না পারায় নূতনকে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করিবার শক্তি এখনও কুত্রাপি জাগে নাই। ইহা অস্বাভাবিক নহে। যুগপ্রবর্তক প্রতিভাকে বুঝিতে একটু দেরীই লাগিবে। কিন্তু আমাদের আশা আছে, সে দিন বেশী দূরে নয়, যেদিন এই নূতন যুগ প্রবর্তক কবি-প্রতিভা বাঙলার সাহিত্যিক-মণ্ডলীতে সাদরে অভ্যর্থিত হইবেন এবং নিজের প্রাপ্য সাহিত্য-সিংহাসনে শ্রদ্ধার সহিত অভিষিক্ত হইবেন।"

নজরুলের স্বপক্ষে যুক্তি স্থাপন করতে গিয়ে আবুল কালাম শামসুদ্দীন বলেন যে, নজরুলের সমকালে তাঁর প্রতিভার বিকাশের বিরুদ্ধে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে কিছু সংখ্যক গোঁড়া মানুষ যেমন তাকে 'কাফের' 'অধার্মিক' হিসেবে গণ্য করেছে, তেমনি কিছু সংখ্যক পণ্ডিত নজরুলের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মত বিশ্ব সাহিত্যের উঁচুভাব না থাকায় হতাশ হয়েছেন– -এসবের উল্লেখ করে তাঁর প্রতিভার একটি নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করতে চেয়েছেন। যুগপ্রবর্তক প্রতিভার উদয়কালে নজরুলকে নিন্দা-গ্লানি লাভ করতে হয় এবং একই রকমভাবে শেকস্‌পীয়র, মিল্টন, হাফেজ-ওমরখৈয়াম প্রমুখকেও যে এমন গালি নিন্দার সম্মুখীন হতে হয়েছে– তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। বাঙলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র এবং মাইকেল মধুসূদনকেও নানা সমালোচনার শিকার হতে হয়েছে, সে কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। আবুল কালাম শামসুদ্দীন তাঁর নিবন্ধে নজরুলের অভ্যুদয়ে রবীন্দ্র মোহমুক্ত সমাজ কর্তৃক তাঁর যুগপ্রবর্তন প্রতিভার বিরুদ্ধে যে বিরূপ মন্তব্য এসেছে–তাকে স্বাভাবিক বলে গণ্য করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি কাব্য বিচারের মানদণ্ড হিসেবে তাঁর নিজস্ব ধারণার কথা উল্লেখ করে বলেছেন:

"কবি সত্য ও সুন্দরের উপাসক। সৌন্দর্য–সৃষ্টি দ্বারা বিশ্বমানবের মঙ্গলের ভিতর দিয়া সত্যে পৌঁছানোই কবির একমাত্র নির্দিষ্ট কর্ম। কবির সৃষ্টি সুন্দর হইল কি না এবং কোন সত্যের দিকে উহা অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিতেছে কিনা, ইহাই হইল কাব্য যাচাই করিবার একমাত্র মাপকাঠি।"

আবুল কালাম শামসুদ্দীন কাব্যকে নীতিকথা হিসেবে গ্রহণ করেন নি। তিনি বলেছেন, 'কবি প্রেমধর্মী। সৌন্দর্যকে প্রেমের চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াই কবি মঙ্গলের ভিতর দিয়া সত্যের সন্ধান করেন।' তাঁর মতে নজরুল তাঁর কাব্যের মাধ্যমে এই সত্যটিকেই প্রকাশ করেছেন।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন নজরুল সম্বন্ধে বলেন যে তিনি কাব্য রচনার মাধ্যমে নিজেকে প্রচার করেননি। তাঁর কাব্যে মানুষ এবং মানবতার কথা আছে। নজরুল হিন্দু বা মুসলমানের কবি নন। তিনি মানুষের কবি, মানবতার কবি। এতদসত্ত্বেও নজরুলের কবিতায় ইসলামের শাশ্বত সত্য প্রকাশ পেয়েছে। তিনি ধর্মে মুসলমান ছিলেন কিন্তু চেতনায় ছিলেন অসাম্প্রদায়িক এবং তাঁর লেখনিতে মুসলমানদের দুঃখ বেদনার কথা প্রকাশ পেয়েছে কারণ তারা হিন্দুদের থেকে পিছিয়ে ছিল। শুধু মুসলমানই নয়, তার কাব্য নিপীড়িত মানুষের ক্রন্দনে সিক্ত এক মহাকাব্য।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন 'সওগাত' জৈষ্ঠ ১৩৩৪ সালে একটি গ্রন্থে সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখেন যে নজরুল পুরোপুরি একজন মৌলিক এবং বস্তুতান্ত্রিক কবি। তাঁর রচনার কোথাও কোন কবির ভাবের অনুসরণ লক্ষ্য করা যায় না।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন 'নূরী' ছদ্মনামে ১৩৩৪ সালের 'সওগাত' শ্রাবণ সংখ্যায় দুঃখের সঙ্গে উল্লেখ করেন যে, 'প্রবাসী' পত্রিকায় নজরুলের কাব্য সমালোচনায় 'বিদ্বেষ

প্রসূত গরল উদ্‌গীরিত' হয়েছে। 'প্রবাসী' একটি উঁচু মানের পত্রিকা হয়েও সাম্প্রদায়িকতা-দুষ্ট হয়ে এই পত্রিকায় এমন মিথ্যাচার হতে পারে তা তাঁর বোধগম্য ছিলনা। নজরুলকে অস্বীকার করাই এই সমালোচনার উদ্দেশ্য ছিল।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন আরও বলেন যে নজরুলের কাব্যে অনেক দোষত্রুটি থাকতে পারে, তিনি রবীন্দ্রনাথের অনেক নীচে, এটাও স্বীকার্য; কিন্তু তিনি কাব্য সাহিত্যে তিনিনূতন রূপ ও প্রাণ এনেছেন, একথা অস্বীকার করা যাবে না। তিনি দুঃখ করে বলেন: "রবীন্দ্রনাথের অন্ধভক্ত 'প্রবাসী' নজরুলকে কবি-স্বীকৃতি দিতে রাজী নন। তিনি বলেন নজরুলের কাব্যে ব্যবহৃত ভাষা 'অবোধ্য' 'হেয়ালী' বলে 'প্রবাসী'র মনে হয়েছে। সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি নিয়ে বিচার করতে গিয়ে 'প্রবাসী' নিজেকেই ক্ষুদ্রত্বে নামিয়ে নিয়ে এসেছে। নজরুলই সাহিত্যে সর্বপ্রথম আরবী-ফারসীর ব্যবহার করেছেন। মোহিতলাল সে জন্যে নজরুলকে অভিনন্দিত করেন।

সমকালে নজরুলের সাহিত্য সমালোচনায় সওগাত, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫ নিকষমণি বিভাগে নজরুলের 'বাঁধন হারা' পত্রোপন্যাসের সমালোচনা করা হয়। এই বিভাগেই নজরুলের 'সিন্ধু হিল্লোল' কাব্যের সমালোচনা প্রকাশিত হয়।

'বাঁধন হারা' সম্বন্ধে সমালোচক লেখেন যে নজরুলের এ উপন্যাসে নজরুল তাঁর রচনায় কাব্য ভাবনা এনেছেন। উপন্যাসে তা শোভনীয় নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর ত্রুটিও রয়েছে, কিন্তু উপন্যাসের মূল গল্পটি অত্যন্ত করুণ, যেন একটা জীবন নাট্যের ট্রাজেডি। সমালোচক স্বীকার করেছেন যে গল্পটি পড়লে অশ্রু সংবরণ করা যায় না। এই উপন্যাসের ভাষা আশ্চর্যরকম জোরালো ও নূতন। সমালোচক বলেন; "কবিতার ন্যায় গদ্য রচনার উপরেও যে কবির অসামান্য ও অনাহত অধিকার আছে, তাহা ইহাতে পূর্ণ প্রকাশিত।"

'সিন্ধুহিল্লোল' কাব্য সমালোচনায় সমালোচক বলেন যে, নজরুলের কাব্যে সর্বাগ্রে পাঠকের যা চোখে পড়ে তা তাঁর 'পৌরুষ'। এই পৌরুষ মহিমা তাঁর সমস্ত কবিতায় উজ্জ্বল। এই কাব্যে 'প্রেম' এক নূতন ধারায় বিম্বিত। এই কাব্যে সিন্ধুর 'বিরহী' 'বিদ্রোহী' এবং 'বুভুক্ষু' রূপ প্রাধান্য পেয়েছে। 'সওগাত' ফাল্গুন ১৩৪১ সালে নজরুলের 'গুলবাগিচা' গানের পুস্তক সমালোচনায় সমালোচক নজরুলের গান সম্বন্ধে উচ্চসিত প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন 'কবি কাজী নজরুল ইসলাম গান রচনায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। আলোচ্য গানের বইখানি কবির সে মর্যাদা অটুট রাখিয়াছে। পুস্ত কখানিতে ঠুংরী, গজল, দাদরা, চৈতী, কাজরী, স্বদেশী, কীর্তন, ভাটিয়ালী, ইসলামী, ধর্মসঙ্গীত, প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের গান সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার সমস্ত গানগুলি লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। কাজী সাহেবের গানগুলির আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে উহাদের কাব্য সম্পদও উচ্চাঙ্গের।'

নজরুল নিজেও তাঁর গানকে কাব্যের উপরে স্থান দিয়েছেন। বাঙ্গলা সঙ্গীতের জগতে সমকালে নজরুলের এমন অবদান আর কোন গীতিকারের ছিলনা। রবীন্দ্রনাথের গানেও এমন ভাব-ভাষা ও সুরের বৈচিত্র লক্ষ করা যায়না।

বস্তুত, 'সওগাত' পত্রিকায় নজরুলের বিভিন্ন গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হয়। নজরুলকে বিকশিত করে তোলার মূলে সে সময় 'সওগাত'-এর ভূমিকা ছিল অসামান্য। 'সওগাত' অগ্রহায়ণ ১৩৫২ সালে আধুনিক বাংলা সাহিত্য শিরোনামে নজরুলের সাহিত্য সম্পর্কে কাজী আব্দুল ওদুদ বলেন:

".....স্বদেশী আন্দোলনের সমস্ত বীর্য নিয়ে তিনি (নজরুল ইসলাম) বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হলেন। তাঁর অপূর্ব তারুণ্য আর অপূর্ব স্বাধীনতা প্রীতি দেখতে দেখতে তাঁকে প্রিয় করে তুললো বাংলার আবাল-বৃদ্ধ বণিতার কাছে। এর সঙ্গে মিলিত হলো তাঁর স্বসম্প্রদায়ের যে তেজোবীর্য লাভের জন্য তাঁর আকাঙ্ক্ষা, আর ১৯১৪-১৮ সনের যুদ্ধোত্তর বিপন্ন ইসলামের জন্য তাঁর বেদনা। নজরুল ইসলাম এ কালের বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে প্রথম সাহিত্যিক যিনি বাংলার মুসলমান ও হিন্দু উভয়ের চিত্ত আন্দোলিত করতে সক্ষম হলেন। .....বাংলার সাহিত্যিক সমাজ আজ প্রায় নিঃসন্দেহ যে, নজরুল বিংশ শতাব্দীর বাংলার–শুধু বাংলার নয়, ভারতের একজন স্মরণীয় কবি।"

নজরুল ইসলাম: জীবনী ও সাহিত্য বিষয়ে কবি আব্দুল কাদির 'সওগাত' জৈষ্ঠ ১৩৫৪ সালে লেখেন:

"সেদিন তাঁর (নজরুল ইসলাম) 'অগ্নিবীণা' ও 'বিষের বাশী'র প্রভাব রবীন্দ্রনাথের 'নৈবদ্য' ও 'বলাকা'র প্রভাবকেও বোধ হয় ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাঁর রচনার অমিত তেজ, উদ্দাম, স্বত:স্ফূর্ততা ও সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য সহজেই ভাবপ্রবণ বাঙালীর মন জয় করে নিয়েছিল। .....নজরুলের শক্তির সর্বোত্তম বিকাশ গীতি-সৃষ্টিতে। অনেকের মতে তিনি বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সুর স্রষ্টা। তাঁর কবিতায় প্রতীকবাদ, প্যান ইসলামবাদ, সমাজতন্দ্রবাদ প্রভৃতি পাঁচ-মিশেলীর সাক্ষাৎ মিললেও তিনি নিঃসন্দেহে বাংলার প্রথম জাতীয় গণতান্ত্রিক কবি।'

'সওগাত' কার্তিক ১৩৩৫ সংখ্যায় জনৈক পুস্তক সমালোচক বলেন:

"'সঞ্চিতা....একত্রে এত রসের সমাবেশ বাংলার আর কোন কবির রচনার মধ্যে আছে বলিয়া আমাদের ধারণা নাই। যাঁহার লেখনী হইতে 'বিদ্রোহী'র ভৈরবনাদ বাহির হইয়াছে। তাঁহারই কণ্ঠে গজলের বীণা নিক্কণ বাজিয়াছে, ইহা ভাবিলে সত্যই অবাক হইতে হয়– আর এই যুগ-প্রবর্তক প্রতিভার শক্তির অসামান্যতার সম্মুখে সবরকম বাকচাতুরী স্তব্ধ হইয়া যায়। ....বিদ্রোহী পাঠে পাঠকের মনে বিস্ময়ের যে ঘোর সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা কাটিতে না কাটিতে তাঁহার 'পূজারিণী' নতুন বিস্ময় লইয়া উপস্থিত হইল। 'পূজারিণী'র পরে 'সাম্যবাদী' পাঠককে আর এক নূতন বিস্ময়ে অভিভূত করে। সবচেয়ে পাঠককে আশ্চর্য করিয়া দিয়াছে কবির গজল গান। এ যেমন অনুপম, তেমনি

অভাবিতপর্ব। কবি প্রতিভার এই অপূর্বতার কারণ: তাঁর ছিল তরুণ, চির নূতন, দুর্দমনীয় আবেগশালী যুবক-মন। এই মনের ধর্মই হইতেছে–অতৃপ্তি, অশান্তি Passion এবং Intense feeling. কাব্যের সজীবতার লক্ষণও ইহাই। নজরুলের কাব্যে এই সমস্ত লক্ষণই পূর্ণভাবে বিদ্যমান। তাই তাহার কাব্যে জরাজীর্ণতা ও বার্ধক্যের কোন চিহ্ন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।"

গ্রন্থ সমালাচনায় সমালোচকের নাম নেই। তবে বেশ বুঝা যায় তিনি একজন পণ্ডিত এবং কাব্য সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ভালই আছে। এক্ষেত্রে বুঝা যায়, নজরুল তাঁর সমকালে তাঁর লেখনীর জন্য সমাদৃত হয়েছিলেন। তাঁর যারা নিন্দুক, তাদের সংখ্যা ছিল সীমিত। তবে নজরুলের সমকালে প্রায় সকলেই তাঁকে 'নূতন ধারা' এবং 'যুগ-প্রবর্তক কবি' হিসবেই গ্রহণ করেছেন।

আমার এ গ্রন্থে 'সওগাত' পত্রিকায় নজরুল সম্বন্ধে যে সব আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে, বিশেষ করে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন তাঁর গ্রন্থে যা সংকলিত করেছেন সেসব নিয়েই আলোচনা করেছি। সমকালে নজরুলকে তাঁর ভালো-মন্দ মিশিয়ে যাঁরা তাঁকে দেখেছেন, বুঝেছেন সে সম্বন্ধেই লিখতে চেয়েছি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসীর সফল প্রয়োগ নজরুল পূর্বে কারও রচনায় তেমন পাওয়া যায় না। নজরুলের কাব্যে গানে- উপন্যাসে- প্রবন্ধে ভাষার এমন কুশলী এবং নান্দিক প্রয়োগ সমকালীন অন্যকোন সাহিত্যিকের মধ্যে দেখা যায় না। নজরুলের বড় কৃতিত্ব তিনি 'রুবাইয়াত-ই-হাফিজ' বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন এবং সে বিষয়ে তাঁর সমকালে তাঁকে অভিনন্দিত করা হয়েছিল। তিনি রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়ামও অনুবাদ করেছিলেন। ভাব-ভাষার প্রয়োগে তাঁর এই অনুবাদ ছিল অনবদ্য। বাঙালী পাঠক সমাজে এই পারশ্যের এই দুই মহান কবির 'রুবাই' কবি নজরুল চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছেন। এদেশে কেউ কেউ ফার্সি থেকে ইংরাজীতে অনুদিত কাব্য থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন। কিন্তু নজরুল সরাসরি ফার্সি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন। হাফিজ এবং ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াত কবি নজরুল ইসলামের হাতে যেমন মোহন সুন্দররূপে ফুটে উঠেছে অন্য কোন কবি বা অনুবাদকের হাতে তা তেমন ফুটে উঠতে পারেনি। কবি নজরুল ইসলাম ছেলেবেলা থেকেই ফার্সি ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করেন। সৈনিক থাকাকালীন সময়ে ফার্সি ভাষা ও সাহিত্যে তিনি আরও দক্ষতা অর্জন করেন।

বস্তুত, সৈনিক জীবনে পারশ্য তথা প্রাচ্য এবং বিশেষ করে রুশ সাহিত্যের সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয় এবং এ সম্পর্ক ছিল প্রত্যক্ষ। তাই ভাব-ভাষায় ফার্সি আমেজ সুরক্ষিত হয়েছিল।

বস্তুত, 'সওগাত' পত্রিকায় নজরুল ছিলেন অনন্য। এই পত্রিকায় তিনি কবিতা, গল্প লিখেছেন এবং এই পত্রিকাতেই তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের সমালোচনা এবং তাঁর সাহিত্য

কর্মের উপরও বিষদ আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। 'সওগাত' পত্রিকার মাধ্যমে তাঁর 'গণসংবর্ধনা'র ব্যবস্থা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু উপস্থিত থেকে বক্তব্য দিয়েছিলেন। কবি অর্থ সংকটে পড়লে 'সওগাত' পত্রিকা এগিয়ে এসেছে। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন এক অসাধারণ প্রীতি-মমতায় নজরুলকে বেঁধে রেখেছিলেন।

বাংলা সাহিত্যে তাঁর সরব আত্মপ্রকাশ 'সওগাত'সহ অন্যান্য পত্রিকায় হলেও 'সওগাত' ছিল তার প্রতিভা বিকাশের সূতিকাগার। এখানে সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের ভূমিকা ছিল অনন্য। নজরুলকে লেখা প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহীম খাঁর চিঠি ও নজরুলের উত্তর, দুটিই ছিল অসাধারণ। প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহীম খাঁ ছিলেন মুসলিম জাগরণের অগ্রপথিকদের একজন। তাঁর লেখায় নজরুলের প্রতি যে গভীর ভালবাসা এবং প্রত্যাশা ছিল, নজরুল তা মাথা পেতে নিয়ে একটি অবিস্মরণীয় উত্তর দিয়েছিলেন ইব্রাহিম খাঁ-কে।

এই উত্তরে নজরুল যা বলেছেন তা থেকে আমরা সহজেই তাঁর মনের কথা বুঝতে পারি। কী অসাধারণ মন্তব্য! কী অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধ! ইসলাম ও মুসলিম সমাজ সম্পর্কে তাঁর গভীর প্রীতিময়তা তাঁর যথার্থ পরিচয়কেই তুলে ধরে! কিন্তু এটাও সত্য যে হিন্দুদের মধ্যে যাঁরা তাঁকে ভালোবেসেছে, পৃষ্ঠপোষকতা করেছে তাঁদেরকে তিনি ভোলেন নি।

প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহীম খাঁ নজরুলকে লিখেছিলেন: "তোমায় কখনো দেখিনি। অনেকবার দেখা করার সুযাগ খুঁজেছি, সে সুযোগ হয়ে উঠে নাই,–দূর হতে শুধু তোমার লেখা পড়েছি, মুগ্ধ হয়েছি, অন্তরের অন্তস্থল হতে ঐ প্রতিভার কাছে বারবার মস্তক নত করেছি আর আল্লার কাছে প্রার্থনা করেছি, 'প্রভো, এ কাঙ্গাল বাঙ্গালী মুসলিম সমাজকে যদি একটি রত্ন দিয়েছ, ওকে রক্ষা করো– সমাজকে দিয়ে ওর কদর করে নিও।.....কাঙ্গাল মুসলিম সমাজ কাঙ্গাল– শুধু ধনে নয়, মনেও। তাই বাঙ্গলার অ-মুসলিমরা তোমার যে কদর করেছেন, মুসলিমরা তা করেন নাই, করতে শেখেন নাই। এ কথা ভেবে অনেক সময় লজ্জায় মাথা নত করেছি, সমাজকে নিন্দা করেছি। বন্ধু মহলে রোষ প্রকাশ করেছি। কিন্তু সে শুধু নিন্দায় ফায়দা কি, শুধু আস্ফালনে ফল কি? সমাজ যে পতিত, দয়ার পাত্র, তাই সেই ভেবে তাকে কখনও স্নেহের হাত বুলিয়ে, কখনও জোরে ধাক্কা দিয়ে জাগাতে হবে, পথে আনতে হবে।.....

সমাজ মরতে বসেছে; তাকে বাঁচাতে হলে চাই সঞ্জীবনী সুধা, কে সেই সুধার পাত্র হাতে এনে এই মরণোন্মুখ সমাজের সামনে দাঁড়াবে, কোন সুসন্তান আপন তপোবলে গঙ্গা আনয়ন করে, এ অগণ্য সাগর-গোষ্ঠীকে পুনর্জ্জীবন দান করবে, কাঙ্গাল সমাজ উৎকণ্ঠিত চিত্তে করুণ নয়নে সেই প্রতীক্ষায় চেয়ে আছে। কে জানিনা; কিন্তু মনে হয়, তোমায় বুঝি খোদা সে শুধা-ভাণ্ডের কিঞ্চিৎ দান করেছেন, তোমার অন্তরের অন্তরালে

বুঝি সে সাধনার বীজ জমা আছে। হাত বাড়াবে কি? একবার সাহসে বুক বেঁধে সে তপশ্চারণে মনোনিবেশ করবে কি?"

ইব্রাহীম খাঁ কি অসাধারণ আবেগ নিয়ে বাঙ্গালী মুসলিম জাতির মুক্তির দূত হিসেবে নজরুলকে পেতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন ইসলামকে নিয়েই তিনি কবিতা ও সাহিত্যচর্চা করবেন। ইব্রাহীম খাঁ অনেক বড় চিঠি লিখেছিলেন। নজরুলও তার জবাব দিয়েছিলেন। এই চিঠিতে তাঁর যথার্থ কবি ও সাহিত্যিক পরিচয় ফুটে উঠেছে। দুইটি চিঠিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইব্রাহীম খাঁর চিঠিতে মুসলিম সমাজের দীনতা হীনতা সর্বোপরি দুর্ভাগ্য গ্রাসের কথা আছে। একজন মুসলমান হিসেবে এ তাঁর মনোবেদনা। এ দিক থেকে তিনি যথার্থই বলেছেন। কিন্তু নজরুল তাঁর চিঠিতে যে কথা বুঝাতে চেয়েছেন, তাহলো তিনি সমাজ সংস্কারক নন। তিনি একজন কবি। কবির কাছে সমাজ আছে, ধর্মও আছে। কিন্তু সবকিছু মানুষকে নিয়েই। এই মানুষ হিন্দু এবং মুসলিম। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্ম পালন করেও তাদের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখতে পারছেনা। হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা এবং বৈরী মনোভাব উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকাতে এই দুই জাতি অনেকটাই সম্মুখ সমরে চলে এসেছে। নজরুল এই দুই জাতিকে মেলাতে 'কাণ্ডারী হুশিয়ার' লিখেছেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এই গানের ভূয়শী প্রশংসা করছেন, বলেছেন এই গান বাঙ্গালীর জাতীয় সঙ্গীত হবে।

ইব্রাহীম খাঁর চিঠির প্রেক্ষিতে নজরুলের উত্তর অসাধারণ শুধু নয়, বলা যেতে পারে গভীর অন্তর্দৃষ্টিসহ তা বোঝারও ব্যাপার আছে। নজরুল অত্যন্ত চমৎকারভাবে অনেক না বলা কথাও এখানে টেনে এনেছেন। ইব্রাহীম খাঁর চিঠির যে উত্তর নজরুল দিয়েছেন তা বেশ বিস্তারিত। তাঁর চিঠিতে আবেগ আছে এবং অভিমানও আছে। তাঁর গোটা চিঠিটা একটা সাহিত্য। নজরুল একটা পর্যায়ে মুসলিম সমাজের কথা বলেছেন যাদের একটি বিশেষ শ্রেণী যাঁরা ধর্মকেই অন্ধ বিশ্বাসে সবার উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। নজরুল তাদের লক্ষ করে বলেন:

"বাঙলার মুসলমান সমাজ ধনে কাঙ্গাল কিনা জানিনে, কিন্তু মনে যে কাঙাল এবং অতিমাত্রায় কাঙাল, তা আমি বেদনার সঙ্গে অনুভব করে আসছি বহুদিন হতে। আমায় মুসলমান সমাজ 'কাফের' খেতাবে যে শিরোপা দিয়েছে তা আমি মাথা পেতে গ্রহণ করেছি। একে আমি অবিচার বলে কোনদিন অভিযোগ করেছি বলে ত মনে পড়েনা। তবে আমার লজ্জা হয়েছে এই ভেবে, কাফের আখ্যায় বিভূষিত হবার মত বড় ত আমি হইনি। অথচ হাফেজ, খৈয়াম-মনসুর প্রভৃতি মহাপুরুষদের সাথে কাফেরের পংক্তিতে উঠে গেলাম।"

এখানে মুসলিম সমাজের মধ্য থেকে যারা নজরুলকে 'কাফের' আখ্যা দিয়েছিল তাদের প্রতি নজরুলের ক্ষোভ ছিল কিন্তু তিনি ব্যঙ্গরসে তাদের সে আঘাত ফিরিয়ে দিয়েছেন। স্বজাতির কাছে থেকে যে আঘাত তাঁর এসেছিল তা তিনি আজীবন ভোলেন নি। অথচ ইব্রাহীম খাঁ, কাজী আব্দুল ওদুদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর

আহমদ, ওয়াজেদ আলি, আবুল হোসেন প্রমুখ ব্যক্তি যে তাঁকে মাথায় রেখেছেন সে কথা তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন। বলেছেন, এই তরুণ বন্ধুদের বুকে তাঁর আসন পাতা রয়েছে। এ আসন প্রীতির আসন। সারা বাংলাদেশে এই তরুণ সমাজ তাঁকে বরণ করে নিয়েছে।

অপরদিকে হিন্দুদের মধ্যেও একটি বড় অংশ তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল। সে সম্বন্ধে নজরুল বলেন:

"হিন্দুরা লেখক-অলেখক জনসাধারণ মিলে যে স্নেহে যে নিবিড় প্রীতি ভালবাসা দিয়ে আমায় এত বড় করে তুলেছেন, তাদের সে ঋণকে অস্বীকার যদি আজ করি, তাহলে আমার শরীরের মানুষের রক্ত আছে বলে কেউ বিশ্বাস করবেনা।" কিন্তু এই হিন্দুদের মধ্য থেকেও নজরুল চরম আঘাতও পেয়েছেন। কিন্তু এদের সংখ্যা সীমিত। এদের প্রসঙ্গে নজরুল ইব্রাহীম খাঁকে লেখেন "অবশ্য কয়েকজন নোংরা হিন্দু ও ব্রাহ্ম লেখক ঈর্ষপরায়ণ হয়ে আমায় কিছুদিন হতে ইতর ভাষায় গালাগালি করছেন এবং কয়েজন গোঁড়া 'হিন্দুসভা'ওয়ালা আমার নামে মিথ্যা রটনাও করে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু এদেরকে আঙ্গুল দিয়ে গোনা যায়। এঁদের আক্রোশ সম্পূর্ণ সম্প্রদায় বা ব্যক্তিগত।

এঁদের অবিচারের জন্য সমস্ত হিন্দু সমাজকে দোষ দিই নাই এবং দিবও না। তাছাড়া আজকার সাম্প্রদায়িক মাত্লামির দিনে আমি যে মুসলমান--এইটেই হয়ে পড়েছে অনেক হিন্দুর কাছে অপরাধ-- আমি যত বেশী অসাম্প্রদায়িক হই না কেন।" নজরুল আরও লেখেন:

'প্রথম গালাগালির ঝড়টা আমার ঘরের দিক অর্থাৎ মুসলমানের দিক থেকেই এসেছিল–এটা অস্বীকার করিনে; কিন্তু তাই বলে মুসলমানেরা যে আমায় কদর করেন নি, এটাও ঠিক নয়, এই প্রসঙ্গেই নজরুল তরুণ মুসলিম সমাজের কথা জোর দিয়ে বলেছেন।"যারা দেশের সত্যিকার প্রাণ-সেই তরুণ মুসলিম বন্ধুরা আমায় যে ভালোবাসা, যে প্রীতি দিয়ে অভিনন্দিত করেছে তাতে নিন্দার কাটা বহু নীচে ঢাকা পড়ে গেছে।"

মুসলিম সমাজ সম্পর্কে ইব্রাহীম খান নজরুলকে যা বলেছিলেন, নজরুল তাঁর জবাবে লিখেছেন: 'আমার কি মনে হয় জানেন? স্নেহের হাত বুলিয়ে এ পচা সমাজের কিছু ভাল কাজ করা যাবে না। যদি সে রকম 'সাইকিক-কিওর'এর শক্তি থাকে, কারুর তিনি হাত বুলিয়ে দেখতে পারেন....। আপনি কি বলেন? আমি কিন্তু অস্ত্র-চিকিৎসার পক্ষপাতী। সমাজ ত হাত পা ছুঁড়বেই, গালিও দেবে; তা সইবার মত শক্ত চামড়া যাঁদের নেই, তাঁদের দিয়ে সমাজসেবা হয়ত চলবেনা। এই জন্য আমি বারে বারে ডাক দিয়ে ফিরছি নির্ভীক তরুণ ব্রতীদলকে।....এরা যশের কাঙাল নয়, মানের ভিখারী নয়। দারিদ্র সইবার মত পেট, আর মার সইবার মতো পিঠ যদি কারুর থাকে, ত এই

তরুণদেরই আছে। এরাই সৃষ্টি করবে নূতন সাহিত্য, এরাই আনবে নূতন ভাবধারা, এরাই গাইবে তাজাব তাজা'র গান।'

মোহাম্মদ; নাসিরউদ্দীন ইব্রাহীম খান ও নজরুলের দুটি চিঠি 'সওগাত' পত্রিকায় ছাপিয়ে দিয়ে নজরুলের ফিলসফি বা দর্শনকে এখানে টেনে আনতে পেরেছেন। সারা জীবন ধরে নজরুল যা বলেছিলেন, তাঁর প্রকাশ তিনি ঘটিয়েছেন তাঁর অসাধারণ চিঠিতে।

এই চিঠিতে নজরুল তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে নিজেকেও একইভাবে বিদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বিদ্রোহী কবিতার সঙ্গে তাঁর নিজের জীবনের মিল রয়ে গেছে। নজরুল বুঝেছেন সমাজ তাঁর 'বিদ্রোহী' ভাবনার ভুল মানে করেছে। কবি গোলাম মোস্তফা 'বিদ্রোহী'কে ব্যঙ্গ করেছেন। নজরুলের মনে হয়েছে ইব্রাহীম খানও হয়তো 'বিদ্রোহী'র ভুল মানে নিয়েছেন। তাই তিনি বলেন: 'বেদনা-সুন্দরের গান গেয়েছি বলেই কি আমি সত্য-সুন্দরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি? আমি বিদ্রোহ করেছি-বিদ্রোহের গান গেয়েছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে-অত্যাচারের বিরুদ্ধে-যা মিথ্যা, কলুষিত, পুরাতন, পচা- সেই মিথ্যা সনাতনের বিরুদ্ধে। ধর্মের নামে ভণ্ডামী ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। হয়ত আমি সব কথা মোলায়েম করে বলতে পারি নি, তলোয়ার লুকিয়ে তার রূপার খাপের ঝকমকানিটাকেই দেখাইনি-- এইতো আমার অপরাধ। এরই জন্য ত আমি বিদ্রোহী। আমি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি, সমাজের সকল কিছু কুসংস্কারের বিধি-নিষেধের বেড়া অকুতোভয়ে ডিঙিয়ে গেছি এর দরকার ছিল মনে করেই।"

'বিদ্রোহী' কবিতার জন্য কেন নজরুলকে 'কাফের' বলা হল তা বোঝা কঠিন। নজরুল বেশ কিছু শব্দ এবং প্রতীক ব্যবহার করেছেন যা তাঁর উদ্দশ্যকে সফল করে তুলেছে। 'বিদ্রোহী' কবিতায় তাঁকে 'কাফের' বলার মতো কোন কিছু নেই। অজ্ঞানতার কারণেই তা হয়েছে।

'মানুষ' আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষকেই আল্লাহ ফেরেস্তা তথা সমস্ত দেব-দেবীদের উপরে সম্মানজনক স্থান দান করেছেন এবং মানুষের প্রতি 'সেজদা' বা নতজানু হওয়ার জন্য অন্য সবাইকে আদেশ করেছেন। ফেরেস্তাদের প্রধান আজাজীল তা করে নি বলে সে শয়তান হয়ে বেহেস্ত বা স্বর্গ থেকে বহিস্কৃত হল। 'আরশ' এবং 'আসন' প্রতীকী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। 'ভগবান' শব্দটি এমনিভাবে ক্ষমতাধরের প্রতীকী ব্যবহার। এখানে সব কিছুই মূলত বৃটিশ এবং শোষক-শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মনোভঙ্গিরই পরিচয় বহন করে। এক সময় একটি কথা ছিল বৃটিশ রাজ্যে সূর্য অস্ত যায়না। এটিও প্রতীকী ব্যবহার। আমরা আশ্চর্য হই এই ভেবে যে নজরুল কি অসাধারণ কৌশলে নানা প্রতীকী শব্দ ব্যবহার করে কবিতাটিকে একটি বিস্ময়কর বস্তু হিসেবে নির্মাণ করতে সক্ষম হলেন।

নজরুলের চিঠিতে নানা বিষয় এসেছে। তার একটি, আর্ট বা শিল্প সম্পর্কে তাঁর চমৎকার বিশ্লেষণ এবং ধারণা। শিল্পের জন্য শিল্প নয়, জীবনের জন্য শিল্প-এ প্রশ্ন যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। উভয় মতবাদে যুক্তি আছে। জীবন সর্বক্ষেত্রেই স্থান করে নিয়েছে। জীবনকে অস্বীকার করে শিল্প গড়ে উঠলে তা 'মনুষ্যপদবাচ্য' হয়না। নজরুল মূলত রোমান্টিক কবি। সুতরাং বেদনা-সুন্দরের পূজা' তো কাব্যে থাকবেই। এটিও তো রোমান্টিক কবিদের একটি বড় বৈশিষ্ট্য। শিল্প যদি প্রাণহীন হয়, তা যত সুন্দরই হোক না কেন তা মানুষের কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়ে। নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতায় অজস্র হিন্দু শব্দ প্রতীকী সৌন্দর্যে অনুপম হয়ে দেখা দিয়েছে। শাস্ত্রকে ছাড়িয়ে তা কাব্য সুষমামণ্ডিত হয়েছে। এমন কবিতা বিশ্ব সাহিত্যে বিরল এবং নজরুলই একমাত্র কবি যিনি এই অনন্য শিল্পকর্মের জন্য পৃথিবী ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত মানুষের শ্রদ্ধা লাভ করবেন। এখানে নজরুল নাস্তিক নন। তিনি এক আল্লাহর সৃষ্টিকেই গৌরবমণ্ডিত করেছেন। যথার্থই তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতাটি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ 'রুদ্ররস' ভিত্তিক লিরিকধর্মী কাব্য শুধু নয়-- মহাকাব্য।

ইব্রাহীম খান 'মুসলিম সাহিত্য' সম্পর্কে যা বলেছেন নজরুল তাঁর যথাযথ উত্তর দিয়েছেন। সাহিত্য কখনও কোন সম্প্রদায় বা 'শাস্ত্রীয়' নির্দেশক হতে পারে না, হলে তা আর কাব্য থাকেনা। মুসলিমদের সৃষ্ট সাহিত্য মুসলিম সাহিত্য হলে হিন্দুদের সৃষ্টি সাহিত্য হিন্দু সাহিত্য হয়ে উঠবে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখতে গিয়ে সুকুমার সেন বাংলা সাহিত্যের একটি অধ্যায়কে 'ইসলামী সাহিত্য' বলে সাহিত্যের একটি বিভাজন এনে দিয়েছেন-যা অবশ্য পরিত্যাজ্য। 'ইসলাম' হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর প্রবর্তিত কোন ধর্ম নয়। তিনি নূতন কোন ধর্ম আনেন নি। প্রথম মানব আদম (আ:) এর সৃষ্টির সঙ্গে যে বিধি বিধান তাঁর জীবনের জন্য দেওয়া হয়েছিল- সেটিই ছিল ইসলাম-যার অপর নাম 'শান্তি'। কবি নজরুল ইসলাম এর যথার্থ ব্যাখ্যাটি দিয়েছেন। তিনি বলেন: 'ইসলামের সত্যকার প্রাণশক্তি গণতন্ত্রবাদ, সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও মহিমা গানই ইসলামের এই অভিনবত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব আমিও স্বীকার করি, যাঁরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী নন, তারাও স্বীকার করেন। ইসলামের এই মহান সত্যকে কেন্দ্র করে কাব্য কেন, মহাকাব্য সৃষ্টি করা যেতে পারে। আমি ক্ষুদ্র কবি, আমার বহু লেখার মধ্য দিয়ে আমি ইসলামের এই মহিমা গানই করেছি, সুতরাং নজরুলকে ভুল বুঝবার কোন অবকাশই আর থাকে না। নজরুল 'পুথি সাহিত্য' কে তাই সাহিত্য বলতে নারাজ। তবে এটা অস্বীকার করা যায় না যে এক শ্রেণীর নিরক্ষর মানুষদের সাহিত্য ক্ষুধাকে 'পুথি সাহিত্য' পরিতৃপ্ত করেছে।

নজরুল ইব্রাহীম খানের পত্রের উত্তরে যা স্পষ্ট করে বলেছেন তা হলো সাহিত্যিক সমাজ এবং জীবনের কথা তাঁর সৃষ্ট রচনায় অন্তর্ভুক্ত করেন ঠিকই, তাঁর সাহিত্য কর্মে সমাজ, জীবন এবং মানুষের কথা অনিবার্যভাবে আসবে, এবং তাঁর এই দিক নির্দেশনা সমাজকে বদলাতে সাহায্য করে।

নজরুল বলেন "যাঁরা মনে করেন–আমি ইসলামের বিরুদ্ধেবাদী বা সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছি, তাঁরা অনর্থক এ ভুল করেন। ইসলামের নামে যে-সব কুসংস্কার মিথ্যা আবর্জনা স্তূপিকৃত হয়ে উঠেছে–তাকে ইসলাম বলে না-মানা কি ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযান? এ-ভুল যাঁরা করেন, তাঁরা যেন আমার লেখাগুলো মন দিয়ে পড়েন দয়া করে–– এছাড়া আমার আর কি বলবার আছে।' এর থেকে স্পষ্ট ভাষণ আর কি হতে পারে। সুতরাং যাঁরা নজরুলকে একদিন 'কাফের' 'শয়তান' বলেছিলেন তাঁরা আজ পৃথিবীতে থাকলেও তাঁদের অনুসারীদের আশা করি বোধোদয় হবে।

প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহিম খানের পত্রের জবাবে বাংরা সাহিত্য সম্পর্কে নজরুল বলেন এ সাহিত্য হিন্দু মুসলমান উভয়ের। বাংলা সাহিত্য প্রথমে হিন্দু অনার্যদের দ্বারা সৃষ্ট। অত:পর আর্যগণ এদেশে এলে সংস্কৃত রাজভাষা হিসেবে তা গণ্য হয়। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত প্রভাব সূচিত হয় বলে কেউ কেউ বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত ভাষার 'দুহিতা' বলে গণ্য করেন। প্রকৃতপক্ষে রাজদরবারে বাংলা ভাষার কোন অস্তিত্ব ছিলনা। বৌদ্ধ আমলে পালি ভাষার সৃষ্টি হয়। হিন্দু সেন আমলে সাধারণ মানুষের মাতৃভাষা বাংলার চর্চা বন্ধ করে দেওয়া হয়। যা হোক, বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষার পাশাপাশি সাধারণের ভাষা হিসেবে প্রসার লাভ করে। নজরুল এ কারণে বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত ভাষার দুহিতা না বলে 'পালিত কন্যা' বলে অভিহিত করেছেন। তুর্কী কর্তৃক বাংলাদেশ জয় করবার পর মুসলমান সুলতানগণই 'বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষক হন। নজরুল ইব্রাহীম খানকে এ সম্পর্কে লিখেছেন: 'বাঙলা সাহিত্য হিন্দু মুসলমানের উভয়েরই সাহিত্য। এতে হিন্দুদের দেবীর নাম দেখলে মুসলমানের রাগ করা যেমন অন্যায়, হিন্দুরও তেমন মুসলমানের দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্যে নিত্য প্রচলিত মুসলমানী শব্দ তাদের লিখিত সাহিত্যে দেখে ভুরু কোঁচকানো অন্যায়। আমি হিন্দু-মুসলমানের মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী। তাই তাদের এ সংস্কারে আঘাত হানার জন্যই মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করি বা হিন্দু দেব-দেবীর নাম নিই। অবশ্য এর জন্য অনেক জায়গায় আমার কাব্যের সৌন্দর্য-হানি হয়েছে। তবু আমি জেনেশুনেই তা করেছি।"

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে নজরুলের কাব্য এবং সাহিত্যে মুসলমানী এবং হিন্দু দেব-দেবীর নাম ব্যবহার কেবলমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে আসেনি। সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা থেকে এসেছে। নজরুল তাঁর চিঠির এক স্থানে উল্লেখ করেছেন 'আমি জানি যে, বাঙলার মুসলমানকে উন্নত করার মধ্যে দেশের সবচেয়ে বড় কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এদের আত্মজাগরণ হয়নি বলেই ভারতের স্বাধীনতার পথ আজ রুদ্ধ।

হিন্দু মুসলমানের পরস্পরের অশ্রদ্ধা দূর করতে না পারলে যে এ পোড়া দেশের কিছু হবে না, এ আমিও মানি এবং আমিও জানি যে, একমাত্র সাহিত্যের ভিতর দিয়েই এ অশ্রদ্ধা দূর হতে পারে।'

আমি দৃঢ়ভাবে বলতে চাই যে, প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহীম খান এবং কবি নজরুল ইসলামের মধ্যে এই পত্রালাপ নিঃসন্দেহে আমাদের অনেক ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটাবে। নজরুল যে যথার্থই হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অগ্রদূত ছিলেন তা আজ পরিপূর্ণ সত্য। তাঁর হাতেই বাঙলা ভাষা সমৃদ্ধি লাভ করেছে। তাঁর কাব্য, গান, উপন্যাস প্রভৃতিতে আরবী-ফার্সি ভাষার প্রয়োগ এবং পাশাপাশি হিন্দুশাস্ত্র থেকে চয়ন করে নেওয়া শব্দ-প্রতিশব্দ বাংলা ভাষাকে এক নূতন মাত্রা দান করে এই ভাষাকে অত্যন্ত শক্তিশালী করে তুলেছে। এই কৃতিত্ব একান্ত করেই নজরুলের। ইব্রাহীম খান ও নজরুলের এই পত্রালাপ তাই একটি ঐতিহাসিক দলিল। এতদসঙ্গে ইব্রাহীম খাঁ ও নজরুলের পত্র দুটি তুলে ধরা হল।

দু'খানা চিঠি

সওগাত সম্পাদক মোহম্মদ নাসিরউদ্দিন উল্লেখ করেনঃ

সাহিত্য সংস্কৃতি তথা জীবনের সর্বস্তরে বাংলার মুসলমানদের দৈন্য বিশ্লেষণ করে এবং তাঁদেরকে জাগিয়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহীম খাঁ নজরুলকে এক পত্রে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। নজরুল যথাসময়ে পত্রখানার উত্তর দেননি। দীর্ঘকাল পরে-১৩৩৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে, নজরুল ঐ পত্রখানা সওগাতের সাহিত্য মজলিসে সকলকে পড়ে শোনান। সমবেত সাহিত্যিক বন্ধুরা প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের এই পত্রকে গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিহিত করেন। তাঁরা নজরুলকে অনুরোধ করলেন এর একটা উত্তর দেবার জন্য। সকলেরই ইচ্ছা, প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের পত্র এবং নজরুলের উত্তর দু'টোই এক সংগে সওগাতে প্রকাশ করা হোক। এর সপ্তাহখানেক পরেই নজরুল উক্ত চিঠির সুদীর্ঘ জবাব দেন। ১৩৩৪ সালের পৌষ সংখ্যা সওগাতে উভয় পত্র প্রকাশিত হয়। নিম্নে উভয় চিঠি উদ্ধৃত করা হলো।

প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহীম তাঁর পত্র

ভাই নজরুল ইসলাম,

তোমায় কখনো দেখিনি। অনেকবার দেখা করার সুযোগ খুঁজেছি, সে সুযোগ ঘটে উঠে নাই, দুর হ'তে শুধু তোমার লেখা পড়েছি, মুগ্ধ হয়েছি, অন্তরের অন্তস্থল হ'তে ঐ প্রতিভার কাছে বার বার মস্তক নত করেছি আর আল্লার কাছে প্রার্থনা করেছি, 'প্রভো, এ কাঙ্গাল বাঙ্গালী মুসলিম সমাজকে যদি একটি রত্ন দিয়েছ, ওকে রক্ষা ক'রো- সমাজকে দিয়ে ওর কদর করে নিও। তোমায় এত আপন ভাবি, এত কদর করি বলেই আজ অকুণ্ঠিত চিত্তে তোমায় তুমি বলে সম্বোধন করছি। তোমার গুণমুগ্ধ. তোমার প্রীতি-আকাঙ্খী, তোমার ভক্ত ভাই-এর এ আবদার তুমি রক্ষা করবে, তাও জানি।

আজ তোমায় কয়টি কথা বলব,-গুরুরূপে নয়, ভাইরূপে, ভক্তরূপে। এ কথাগুলি বলব বলে অনেকবার তোমার সাক্ষাৎ খুঁজেছি, পাই নাই, কিন্তু কথাগুলিও বুকের তলে অনুদিন তোলপাড় করছে; তাই পত্র মারফৎই বলতে চেষ্টা করছি।

আমি আগেই বলেছি, বাঙ্গলার মুসলিম সমাজ কাঙ্গাল--শুধু ধনে নয়, মনেও। তাই বাঙ্গলার অ-মুসলিমরা তোমার যে কদর করেছেন, মুসলিমরা তা করেন নাই, করতে শেখেন নাই। এ কথা ভেবে অনেক সময় লজ্জায় মাথা নত করেছি, সমাজকে নিন্দা করেছি, বন্ধু মহলে রোষ-প্রকাশ করেছি। কিন্তু সে শুধু নিন্দায় ফায়দা কি, শুধু-আস্ফালনে ফল কি? সমাজ যে পতিত, দয়ার পাত্র; তাই সেই ভেবে তাকে কখনও স্নেহের হাত বুলিয়ে, কখনও জোরে ধাক্কা দিয়ে জাগাতে হবে, পথে আনতে হবে। আর সমাজের কাছে ত আমার সে আবদারের অধিকার নাই, যে-আবদার তোমার কাছে আমি করতে পারি। তাই এবার সমাজকে ছেড়ে তোমার দিকে ফিরছি। সমাজ মরতে বসেছে; তাকে বাঁচাতে হলে চাই সঞ্জীবনী-সুধা, কে সেই সুধার পাত্র হাতে এনে এই মরণোন্মুখ সমাজের সামনে দাঁড়াবে, কোন সুসন্তান আপন তপোবলে গঙ্গা আনয়ন করে, এ অগণ্য সাগর-গোষ্ঠীকে পুনর্জ্জীবন দান করবে, কাঙ্গাল সমাজ উৎকণ্ঠিত চিত্তে করুণ নয়নে সেই প্রতীক্ষায় চেয়ে আছে। কেন জানি না; কিন্তু মনে হয়, তোমায় বুঝি খোদা সে সুধা-ভাণ্ডের কিঞ্চিৎ দান করেছেন, তোমার অন্তরের অন্তরালে বুঝি সে-সাধনার বীজ জমা আছে। হাত বাড়াবে কি? একবার সাহসে বুক বেঁধে সে তপশ্চারণে মনোনিবেশ করবে কি?

সুদূর অতীত ইতিহাসের প্রান্তসীমার ওপার হ'তে যে অস্পষ্ট, অর্দ্ধশ্রুত মায়াধ্বনি ভেসে আসে, সে কবির কণ্ঠস্বর!--কবি যে যুগে যুগে সত্যের গীতি, কল্যাণের গীতি, বিরাট অনন্ত মহা-জীবনের নিগূঢ় ভিত্তি কর্ম্মের উদ্বোধন-গীতি গেয়ে এসেছে। স্নেহ-বাৎসল্য-ভরপুর মাতৃক্রোড়ে, আধনিমীলিত-আঁখি শিশুর শয্যাপার্শ্বে, নবীন-নবীনার মিলন-তীর্থ বিবাহ-বাসরে, ধর্ম্মযাজকের উন্নত বেদীতে, কর্ম্মবীরের উলঙ্গ অসি-বর্শার রঙ্গ-ভূমি যুদ্ধক্ষেত্রে সমর-শেষে বিজয়ের উল্লাস-নিনাদে, শহীদের শোকে, নিহতদের কল্যাণ-কামনায়, মহাযাত্রীর সমাধিধারে কবির লীলায়িত বাণী-ধ্বনি যুগে যুগে ঝঙ্কৃত হয়েছে; মহামানবের মনোজ্ঞ ক'রে যখনই যিনি যে-বাণী প্রচার করতে চেয়েছেন, তিনি যত বড় মহাসত্যই প্রচার করুন না কেন, তিনি কবির লালিত্বে মধুর ক'রে তা বলতে চেয়েছেন--বলেছেন। কারণ বিশিষ্ট শক্তিস্ফুরিত স্বল্পসংখ্যক বিশেষজ্ঞ রস-শূন্য নির্যাস বাণীর মর্যাদা রক্ষা করতে পারেন, কিন্তু বিশ্বমানবের চিত্ত স্পর্শ করতে হলে সেই ভাব-উদ্বেল চঞ্চল তরঙ্গায়িত বচন-প্রবাহেই করতে হবে, যাকে ধরবার জন্য খোদাতা'লার স্থাপিত রাজধানীর দুই পার্শ্বের বেতার ষ্টেশন দুইটি অনুদিন এত উদগ্রীব এবং যার মৃদু আঘাতে প্রাণের বীণার নীরব তারে সহসা আকুল রাগিনীঝঙ্কার জেগে উঠে মানবদেহের স্নায়ুর তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে উন্মাদনার তড়িৎ প্রবাহ ছুটিয়ে দেয়। তুমি সেই কবিদের একজন, তোমার কণ্ঠে সেই সঞ্জীবনী সুধার উন্মাদনা আছে।

কিন্তু ভাই, তোমায় জিজ্ঞাসা করছি, কোন ব্রতে তোমার সে কণ্ঠস্বর তুমি নিয়োজিত করেছ? তোমার প্রতিভা অদ্ভুত, কিন্তু তারো চেয়ে গুরুতর তোমার দায়িত্ব! কড়ির মালিক যে, তার নিকাশ না দিলেও বড় আসে যায় না; কিন্তু মাণিকের মালিকের নিকাশ দিতেই হবে; তোমার প্রতিভাকে ত তোমার সার্থক করতেই হবে!

কোন পথে সে সার্থকতার অন্বেষণ করবে? বিদ্রোহে? উত্তম;--কিন্তু বিদ্রোহকেও সুনিশ্চিত উদ্দেশ্যযুক্ত করতে হবে--শুধু তোমার যখন চাহে এ মন যা 'উন্মাদ' 'ঝঞ্ঝা'র মত চললে তোমার জীবনের সার্থকতার নৈকট্য কোথায়? তৈমুরের বিরাট দুর্বার অভিযানের দিকে আমরা বিস্ময়ে চেয়ে থাকি, তারপর ক্লান্ত চোখ ফিরিয়ে নিই, তারপর তার কথা ভুলে যাই; কিন্তু বাবরের ক্ষুদ্রতর অভিযানের কথা ভুলতে পারি না--তাঁর অভিযান আমাদিগকে দিয়েছে--দিল্লী, আগ্রা, ময়ুরাসন, সর্ব্বোপরি দিয়েছে তাজমহল। তোমার কাছে আমরা চাই বাবরের অভিযান, যে-অভিযানের দক্ষিণে-বামে,, অগ্রে-পশ্চাতে নব নব সৃষ্টির সৌধ গড়ে ওঠে।

বাঙলার মুসলিমরা তোমার সম্যক কদর করে নাই, কিন্তু তাই বলে কি তাদের তুমি ছেড়ে যাবে? তোমার ক্ষেত্র মুসলিম সাহিত্যে-বাঙালী মুসলিম চেয়ে আছে তোমার কণ্ঠ দিয়ে ইসলামের প্রাণবাণী পুনঃ প্রতিধ্বনিত হবে; ইসরাফীলের শিঙ্গার মত সেই প্রতিধ্বনি এই নিদ্রিত সমাজকে মহা-আহ্বানে জাগ্রত করবে। বাঙ্গলার আর দশ জন কবির মত যদি তুমি কবিতা লেখ, তবে তোমার প্রতিভা আছে, স্থায়ী আসন তুমি পাবে; কিন্তু সে-আসন মাত্র, সিংহাসন নয়, আর বাঙ্গলার মুসলমান সাহিত্যরাজ্যে সিংহাসন খালি পড়ে রয়েছে, তুমি শুধু দখল করলেই হয়। মধুসূদন যদি শুধু ইংরাজী কাব্যই লিখতেন, তবে হয় ত একজন বাইরন হতে পারতেন, কিন্তু মধুচক্র-রচয়িতা হ'তে পারতেন না। কিন্তু আমি শুধু যশের, শুধু প্রতিষ্ঠার দিক দিয়ে এ প্রশ্নের বিচার করছি না। আমার বক্তব্য এই, যেখানে দশটা অভাব আছে, সেখানে যদি সব অভাবগুলি একসঙ্গে দূর না করা যায়, তবে যেটি সবচেয়ে বড় অভাব, সেইটি আগে দূর করার চেষ্টা করতে হয়।

এখন বিচার করতে হয়, তুমি বাঙালী, তুমি কবি, তুমি মুসলিম, বাঙলার কোন কল্যাণ সাধনে তোমার আগে অগ্রসর হওয়া দরকার।

বাঙালীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দরিদ্র, সব চেয়ে বেশী অজ্ঞ, সব চেয়ে বেশী আত্মভোলা তোমারই ভাই এই মুসলিমগণ। আর বাংলা সাহিত্যে সব চেয়ে অবহেলিত, সব চেয়ে কলঙ্কিত, সব চেয়ে নিন্দিত, কুলিখিত বিষয় ইসলাম। ইসলামী শাস্ত্র, সাহিত্য, সভ্যতা, ইতিহাস বাঙলার সাহিত্যে হয় নাই, না হয় বিকৃতরূপে আছে। যিনি বাঙলার সাহিত্যে ইসলামের সত্যসনাতন নিষ্কলঙ্ক চিত্র দান করবেন, যিনি 'এই সব মূক ম্লান মুখে' ভাষা দিবেন, এই সব ভগ্ন শুষ্ক শ্রান্ত বুকে' আশা ধ্বনিয়ে তুলবেন, যিনি ইসলামের সত্যস্বরূপ দেশের সম্মুখে ধরে মুসলিমের বুকে বল দেবেন, অ-মুসলিমের বুক হতে

ইসলাম-অশ্রদ্ধা দুর করতঃ হিন্দু মুসলমান মিলনের সত্য ভিত্তির পত্তন করবেন, তিনিই হবেন বর্তমানের শ্রেষ্ঠতম দেশ-হিতৈষী, তিনিই হবেন বাঙ্গালী মুসলিমের মুক্তির অগ্রদূত। তুমি চেষ্টা করলে তাই হতে পার; তুমি সেই মহা গৌরবের আসন দখল করতে পার, তুমি এইরূপে তোমার কবি প্রতিভাকে, তোমার জীবনকে, তোমার মানবতাকে সহজতম রূপে সার্থক করতে পার।

আরো এক কথা। এই বাঙ্গালী মুসলিমের মুক্তির অগ্রদূত রূপে যে তুমি আসবে, সে কোন পথে? বিদ্রোহের পথে? আমার মনে হয়, তা নয়। ইংরেজীতে একটি কথা আছে, Line of least resistance বা লঘুতম বাধার পথে অগ্রসর হওয়া সমীচীন। ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কিছু নাই; ইসলাম আধুনিকতম উন্নততম ধর্ম্ম; তবে যে বাঙলার মুসলিমরা অনেক কুসংস্কার পড়েছে, সে ইসলামের দোষ নয়; এই হতভাগ্যরা ইসলামের সাথে ঐ কুসংস্কারগুলি পোষণ করছে। এখন এই কুংস্কারগুলি দূর করতেই হবে; কিন্তু সেগুলি যে ইসলামের অনুশাসন নয়, বরং ইসলামের বিরুদ্ধ মত, এই বলে সে-গুলির নিন্দা করতে হবে--ইসলামকে, ইসলামের কোন অনুষ্ঠানকে নিন্দা করে নয়। কারণ যারা কুসংস্কারে ডুবে ইসলামের পবিত্র নামে হয়ত অজ্ঞাতে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করছে, তারাই ইসলামের নিন্দা সইতে পারে না; সুতরাং ইসলামের নিন্দার নামে খুব ভাল কথা বল্লেও তারা শুনবে না; যাদের শুনাবার জন্য বলা তারাই যদি না শুনে, তবে সে বলায় লাভ কি? কিন্তু মুসলিমদের একটা গুণ আছে, যা আর কোন জাতির নেই; সে ধর্ম্মের নামে পাগল হয়; তাই সে হাফিজ-রুমীকে সত্য-সাধক বলে বরণ করে নিয়েছে; তাই সে শেখ সাদীকে দৈনন্দিন জীবনের বহু কাজে আদর্শ করেছে। তোমার বিদ্রোহী পড়ে যারা বিদ্রোহী হয়েছিলেন, তাঁদেরই একজন তোমার 'সুবেহ্ উন্মিদ' পড়ে আনন্দে, গর্ব্বে লাফিয়ে উঠেছিলেন--আর নাচতে নাচতে এসে আমায় বলেছিলেন, নজরুল যদি এমনই ধারা লিখত, তবে বাঙলার আলিমরা যে তাকে মাথায় করে রাখত (যিনি বলছিলেন, তিনি একজন আলেম)। এ কথা কয়টি তোমায় ভেবে দেখতে বলি। বাঙলার মৌলানা রুমীর আসন খালি পড়ে রয়েছে, তুমি তাই দখল করে ধন্য হও, বাঙলার মুসলিমকে বাঙলার সাহিত্যকে ধন্য কর।

তাই আজ বড় আশায়, বড় ভরসায়, বড় সাহসে, বড় মিনতির স্বরে তোমায় বলছি, ভাই, কাঙাল মুসলিমের বড় আদরের ধন তুমি, তুমি এই দিকে, পতিত মুসলিম সমাজের দিকে, এই অবহেলিত ইসলামের দিকে একবার চাও, তাদের ব্যথিত চিত্তের করুণরাগিনী তোমার কণ্ঠে ভাষা লাভ করে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলুক, তাদের সুপ্ত প্রাণের জড়তা তেমার আকুল আহ্বানের উন্মাদনায় চেতনাময়ী হউক, ইসলামের মহান উদার উচ্চ আদর্শ তোমার কবিতায় মূর্ত্তি লাভ করুক, তোমার কাব্যসাধনা ইসলামের মহাগীতিতে চরম সার্থকতায় ধন্য হোক। আমীন।

অনেক কথা বলে ফেললাম, ভাই, মাফ করো। ভাইয়ের কাছে ভাই যদি এমন প্রাণ খুলে কথা না বলবে, তবে বলবে কোথায়?

নজরুলের উত্তর

শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খান সাহেব!

আমাদের আশি বছরে নাকি স্রষ্টা ব্রহ্মার একদিন। আমি অত বড় স্রষ্টা না হ'লেও স্রষ্টা ত বটে, তা আমার সে-সৃষ্টির পরিসর যত ক্ষুদ্র পরিধিই হোক! কাজেই আমারও একটা দিন অন্ততঃ তিনটে বছরের কম যে নয়, তা অন্য কেউ বিশ্বাস করুক চাই না করুক, আপনি নিশ্চয় করবেন।

আপনার ১৯২৫ সালের লেখা চিঠির উত্তর দিচ্ছি ১৯২৭ সালের আয়ু যখন ফুরিয়ে এসেছে তখন!

এমনও হ'তে পারে, ১৯২৭-এর সাথে সাথে হয়ত বা আমরাও আয়ু ফুরিয়ে এসেছে- তাই আমি আমারও অজ্ঞাতে কোনো অনির্দ্দেশের ইঙ্গিতে আমার শেষ বলা বলে যাচ্ছি আপনার চিঠির উত্তর দেওয়ার সুযোগে! কেননা, আমি এই তিন বছরের মধ্যে কারুর চিঠির উত্তর দিয়েছি, এত বড় বদনাম আমার শত্রুতেও দিতে পারবেনা--বন্ধুরা ত নয়ই। অবশ্য, আয়ু আমার ফুরিয়ে এসেছে--এ সুসংবাদটা উপভোগ করার মত সৎসাহস আমার নেই, বিশ্বাসও হয়ত করিনে; কিন্তু আমারই স্বজাতি অর্থাৎ কবি জাতীয় অনেকেই এ-বিশ্বাস করেন এবং আমিও যাতে বিশ্বাস করি-তার জন্যে অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয় যথেষ্ট পরিমাণেই করছেন। কিন্তু, আমার শরীরের দিকে তাকিয়ে তাঁরা যে নিঃশ্বাস মোচন করেন, তা হ্রস্ব নয় এবং সে-নিঃশ্বাস বিশ্বাসীরও নয়! হতভাগা আমি, তাঁদের এই আমার প্রতি অতি মনোযোগ নাকি প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করতে পারিনে--মন্দ লোকে এমন অভিযোগও করেছে তাঁদের দরবারে।

লোকে বললেও আমি মনে করতে ব্যথা পাই যে, তাঁরা আমার শত্রু। কারণ, একদিন তাঁরাই আমার শ্রেষ্ঠবন্ধু ছিলেন। আজ যদি তাঁরা সত্যি সত্যিই আমার মৃত্যুকামনা করেন, তবে তা আমার মঙ্গলের জন্যই, এ আমি আমার সকল হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করি। আমি আজও মানুষের প্রতি আস্থা হারাই নি- তাদের হাতের আঘাত যত বড় এবং যত বেশীই পাই। মানুষের মুখ উল্টে গেলে ভূত হয়, বা ভূত হ'লে তার মুখ উল্টে যায়; কিন্তু মানুষের হৃদয় উল্টে গেলে সে যে ভূতের চেয়েও কত ভীষণ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হিংস্র হয়ে উঠে-তাও আমি ভাল ক'রেই জানি। তবু আমি মানুষকে শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি। স্রষ্টাকে আমি দেখিনি, কিন্তু মানুষকে দেখেছি। এই ধূলিমাখা পাপলিপ্ত অসহায় দুঃখী মানুষই একদিন বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত করবে, চির-রহস্যের অবগুণ্ঠন মোচন করবে, এই ধুলোর নীচে স্বর্গ টেনে আনবে--এ আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। সকল ব্যথিতের ব্যথায়, সকল অসহায়ের অশ্রুজলে আমি আমাকে অনুভব করি, এ আমি একটুও বাড়িয়ে বলছিনে। এই ব্যথিতের অশ্রুজলের মুকুরে যেন আমি আমার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। কিছু করতে যদি না-ই পারি ওদের সাথে প্রাণ ভরে যেন কাঁদতে পাই।

কিন্তু এ আপনার চিঠির উত্তর হচ্ছে না।

দেখুন, চিঠি না লিখতে লিখতে চিঠি লেখার কায়দাটা গেছি ভুলে। তাতে করে কিন্তু লাভ হয়েছে অনেক। যদিও চোখ-কান বুঁজে উত্তর দিয়ে ফেলি কারুর চিঠির, সে-উত্তর পড়ে তাঁর প্রত্যুত্তর দেবার মত উৎসাহ বা প্রবৃত্তির ইতি ঐখানেই হয়ে যায়। কেননা, সেটা তাঁর চিঠির উত্তর ছাড়া আর সব কিছুই হয়। এ বিষয়ে ভুক্তভোগীর সাক্ষ্য নিতে পারেন। সুতরাং, এটাও যদি আপনার চিঠির উত্তর না হয়ে আর কিছুই হয়, তবে সেটা আপনার অদৃষ্টের দোষ নয়, আমার হাতের অখ্যাতি।

আমাদের দেখা না হ'লেও শোনার ত্রুটি কোনো পক্ষ থেকেই ঘটেনি দেখছি। আপনাকে চিনি, আপনি আমায় যতটুকু চেনেন তার চেয়েও বেশী ক'রে ; কিন্তু জানতে যে আজও পারলাম না, তাঁর জন্য অভিযোগ আমার অদৃষ্টকে ছাড়া আর কাকে করব বলুন। এতদিন ধরে বাঙলার এত জায়গা ঘুরেও যখন আপনার সঙ্গে দেখা হ'ল না, তখন আর যে হবে, সে আশা রাখিনে। বিশেষ করে আজ যখন ক্রমেই নিজেকে জানাশোনার আড়ালে টেনে নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এ ভালই হয়েছে--অন্ততঃ আপনার দিক থেকে। আমার দিকের ক্ষতিটাকে আমি সইতে পারব এই আনন্দে যে, আপনার এত শ্রদ্ধা অপাত্রে অর্পিত হয়েছে ব'লে দুঃখ করবার সুযোগ আপনাকে দিলাম না। এ আমার বিনয় নয়, আমি নিজে অনুভব করেছি যে, আমায় শুনে যাঁরা শ্রদ্ধা করেছেন, দেখে তাঁরা তাঁদের সে-শ্রদ্ধা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছেন। তাই আমি আজ অন্তরে অন্তরে প্রার্থনা করছি, কাছে থেকে যাঁদের কেবল ব্যথাই দিলাম দূরে গিয়ে অন্ততঃ তাঁদের সে-দুঃখ ভুলবার অবসর যদি না দিই, তবে মানুষের প্রতি আমার ভালোবাসা সত্য নয়।

তা ছাড়া, নৈকট্যের একটা নিষ্ঠুরতা আছে। চাঁদের জ্যোৎস্নায় কলঙ্ক নেই, কিন্তু চাঁদে কলঙ্ক আছে। দূরে থেকে চাঁদ চক্ষু জুড়ায়, কিন্তু মৃত চন্দ্রলোকে গিয়ে কেউ খুশী হয়ে উঠবেন বলে মনে হয় না। বাতায়ন দিয়ে যে সূর্য্যালোক ঘরে আসে, তা আলো দেয়, কিন্তু চোখে দেখার সূর্য্য দগ্ধ করে। চন্দ্র-সূর্য্যকে আমি নমস্কার করি, কিন্তু তাঁদের পৃথিবী দর্শনের কথা শুনলে আতঙ্কিত হয়ে উঠি। ভালোই হয়েছে ভাই, কাছে গেলে হয়ত আমার কলঙ্কটাই বড় হয়ে দেখা দিত।

তারপর, শ্রদ্ধার কথা। ওদিক দিয়ে আপনার জিতে যাবার কোনো আশা নেই বন্ধু। শ্রদ্ধা যদি ওজন করা যেত, তা হ'লে আমাদের দেশের একজন প্রবীন সম্পাদক-যিনি মানুষের দোষগুণ বানিয়ার মত ক'রে কড়ায় গণ্ডায় ওজন করতে সিদ্ধহস্ত, তাঁর কাছে গিয়েই এর চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে যেত! গ্রহের ফেরে তাঁর কাঁচিপাকি ওজনের ফের আমার পক্ষে কোনো দিনই অনুকুল নয়; তা সত্ত্বেও আপনিই হারতেন, এ আমি জোর ক'রে বলতে পারি।

হঠাৎ মুদির প্রসঙ্গটা এসে পড়বার কারণ আছে, বন্ধু। জানেনই ত, আমরা কানাকড়ির খরিদ্দার। কাজেই ওজনে এতটুকু কম হ'তে দেখলে প্রাণটা ছাঁৎ ক'রে

ওঠে। মুদিওয়ালার ওতে লাভ কতটুকু হয় জানিনে, কিন্তু আমাদের ক্ষতির পরিমাণ আমরা ছাড়া কেউ বুঝবে না, মুদিওয়ালা ত নয়ই। তবু মুদিওয়ালাকে তুল দাঁড়ি ধরতে দেখলে একটু ভরসা হয় যে, চোখের সামনে অতটা ঠকাতে তার বাধবে; কিন্তু তার পাঁচ সিকে মাইনের নোংরা চাকরগুলো যখন দাঁড়িপাল্লার মালিক হয়ে বসে, তখন আর কোনো আশা থাকে না। আগেই বলেছি, আমরা দরিদ্র খরিদ্দার। থাকত বড় বড় মিঞাদের মত সহায়-সম্বল, ত' হ'লে এ অভিযোগ করতাম না।

পায়া-ভারী লোকের ভারী সুবিধে। তা সে পায়া-ভারী পায়ে ফাইলেরিয়া--গোদ হয়েই হোক, বা ভার গুণেই হোক! এঁদের তুলতে হয় কাঁধে ক'রে, আর কাছে যেতে হয় মাথাটা ভূঁইসমান নীচু ক'রে। ব্যবসা যারা বোঝে, তারা অন্য দোকানীর বড় খদ্দেরকে হিংসা ও তজ্জনিত ঘৃণা যতই করুক, তাঁকে নিজের দোকানে ভিড়োতে তার--দোকানের সবটুকু তেল তার ভারী পায়ে খরচ করতে তার এতটুকু বাধে না। দরকার হ'লে তার পুত্র ছোটে তেলের টিন ঘাড়ে করে, সাঁতরে পার হয় রূপনারায়ণ নদ, তাঁর ভারী পায়ে ঢালে তৈল, তা সে পা যতই কেন ঘানি-গাছের মত অবিচলিত থাক। সাথে সে ভাড়াটে ভাঁড়ও স্তুতি-গাইয়ে নিয়ে যেতেও ভুলে না।

থাক এখন এসব বাজে কথা। অনেক কথার উত্তর দিতে হবে।

আমি আপনার মত অসঙ্কোচে তুমি বলতে পারলাম না বলে ক্ষুন্ন হবেন না যেন। আমি একে পাড়াগাঁয়ে স্কুল-পলানো ছেলে, তার ওপর পেটে ডুবুরি নামিয়ে দিলেও 'ক' অক্ষর খুঁজে পাওয়া যাবে না (পেটে বোমা মারার উপমাটা দিলাম না স্পেশাল ট্রিবিউনালের ভয়ে)। যদি বা খাজা বা ইবরাহিম খানকে তুমি বলতে পারতাম, কিন্তু কলেজের প্রিন্সিপাল সাহেবের নাম শুনেই আমার হাত-পা একেবারেই পেটের ভিতর সেঁদিয়ে গেছে! আরে বাপ! স্কুলের হেডমাষ্টারের চেহারা মনে করতেই আমার আজও জলতেষ্টা পেয়ে যায়, আর কলেজের প্রিন্সিপাল--সে না জানি আরো কত ভীষণ! আমার স্কুল-জীবনে আমি কখনো ক্লাসে বসে পড়েছি, এত বড় অপবাদ আমার চেয়ে এক নম্বর কম পেয়ে যে লাষ্টবয়' হয়ে যেত-সেও দিতে পারবে না। হাইবেঞ্চের উচ্চাসন হ'তে আমার চরণ কোনদিনই টলেনি, ওর সাথে আমার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়ে গেছিল। তাই হয়ত আজো বক্তৃতামঞ্চে দাঁড় করিয়ে দিলে মনে হয়, মাষ্টার মশাই হাইবেঞ্চে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন! যার রক্তে রক্তে এত শিক্ষক-ভীতি, আপনি সাধ্য সাধনা করেও তুমি বলাতে পারবেন না, এ স্থিরনিশ্চিত। এইবার পালা শুরু।

বাঙলার মুসলমান সমাজ ধনে কাঙাল কি না জানিনে, কিন্তু মনে যে কাঙাল এবং অতিমাত্রায় কাঙাল, তা আমি বেদনার সঙ্গে অনুভব করে আসছি বহুদিন হ'তে। আমার মুসলমান সমাজ 'কাফের' খেতাবে যে শিরোপা দিয়েছে, তা আমি মাথা পেতে গ্রহণ করেছি। একে আমি অবিচার বলে কোনদিন অভিযোগ করেছি বলে ত মনে পড়ে না। তবে আমার লজ্জা হয়েছে এই ভেবে, কাফের-আখ্যায় বিভূষিত হবার মত বড় ত আমি

হইনি! অথচ হাফেজ খৈয়াম-মনসুর প্রভৃতি মহাপুরুষদের সাথে কাফেরের পংক্তিতে উঠে গেলাম!

হিন্দুরা লেখক-অলেখক জন-সাধারণ মিলে যে স্নেহে যে নিবিড় প্রীতি ভালোবাসা দিয়ে আমায় এত বড় করে তুলেছেন, তাঁদের সে ঋণকে অস্বীকার যদি আজ করি, তা হ'লে আমার শরীরে মানুষের রক্ত আছে বলে কেউ বিশ্বাস করবে না। অবশ্য, কয়েকজন নোংরা হিন্দু ও ব্রাহ্ম লেখক ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে আমায় কিছুদিন হতে ইতর ভাষায় গালাগালি করছেন এবং কয়েকজন গোঁড়া 'হিন্দুসভা'ওয়ালা আমার নামে মিথ্যা কুৎসা রটনাও করে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু এঁদেরে আঙ্গুল দিয়ে গোণা যায়। এঁদের আক্রোশ সম্পূর্ণ সম্প্রদায় বা ব্যক্তিগত। এঁদের অবিচারের জন্য সমস্ত হিন্দুসমাজকে দোষ দিই নাই এবং দিবও না। তাছাড়া, আজকাল সাম্প্রদায়িক মাতলামির দিনে আমি যে মুসলমান --এইটেই হয়ে পড়েছে অনেক হিন্দুর কাছে অপরাধ, আমি যত বেশী অসাম্প্রদায়িক হই না কেন।

প্রথম গালাগালির ঝড়টা আমার ঘরের দিক অর্থাৎ মুসলমানের দিক থেকেই এসেছিল- --এটা অস্বীকার করিনে; কিন্তু তাই বলে মুসলমানেরা যে আমায় কদর করেন নি, এটাও ঠিক নয়। যারা দেশের সত্যিকার প্রাণ সেই তরুণ মুসলিম বন্ধুরা আমায় যে-ভালোবাসা, যে প্রীতি দিয়ে অভিনন্দিত করেছেন, তাতে নিন্দার কাঁটা বহু নীচে ঢাকা পড়েগেছে। প্রবীণদের আশীর্বাদ মাথার মণি হয়ত পাইনি, কিন্তু তরুণদের ভালোবাসা--বুকের মালা আমি পেয়েছি। আমার ক্ষতির ক্ষেতে ফুলের ফসল ফলেছে।

এই তরুণদেরই ত নেতা ইবরাহিম খান, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, আবুল মনসুর, ওয়াজেদ আলী, আবুল হোসেন। আর এই বন্ধুরাই ত আমায় বড় করেছেন, এই তরুণদের বুকে আমার জন্য আসন পেতে দিয়েছেন--প্রীতির আসন! ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ফরিদপুরে যারা তাদের গলার মালা দিয়ে আমায় বরণ করল, তারা এই তরুণেরই দল। অবশ্য, এ তরুণের জাত ছিল না। এরা ছিল সকল জাতির।

সকলকে জাগাবার কাজে আমায় আহ্বান করেছেন। আমার মনে হয়, আপনাদের আহ্বানের আগেই আমার ক্ষুদ্র শক্তির সবটুকু দিয়ে এদের জাগাবার চেষ্টা করেছি--শুধু যে লিখে, তা নয়--আমার জীবনী ও কর্মশক্তি দিয়েও।

আমার শক্তি স্বল্প, তবু এই আট বছর ধরে আমি, দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ঘুরে কৃষক-শ্রমিক তরুণদের সঙ্ঘবদ্ধ করবার চেষ্টা করেছি- লিখেছি, বলেছি, চারণের মত পথে পথে গান গেয়ে ফিরেছি। অর্থ আমার নাই, কিন্তু সামর্থ্য যেটুকু আছে, তা ব্যয় করতে কুণ্ঠিত কোনদিন হয়েছি, এ-বদনাম আর যেই দিক, আপনি দেবেন না বোধ হয়। আমার এই দেশ-সেবার, সমাজ-সেবার অপরাধের জন্য শ্রীমৎ সরকার বাবাজির আমার উপর দৃষ্টি অতিমাত্রায় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। আমার সবচেয়ে চলতি বইগুলোই

গেল বাজেয়াফত হয়ে। এই সে-দিনো পুলিশ আবার আমায় জানিয়ে দিয়েছে, আমার নব-প্রকাশিত 'রুদ্র-মঙ্গল' আর বিক্রি করলে আমাকে রাজদ্রোহ অপরাধে ধৃত করা হবে। আমি যদি পাশ্চাত্য ঋষি হুইটম্যানের সুরে সুর মিলিয়ে বলি,--

"Behold, I do not give a little charity,
When I give, I give myself."

তা'হলে সেটাকে অহঙ্কার ব'লে ভুল করবেন না..... ।

আপনি সমাজকে পতিত, দয়ার পাত্র বলেছেন। আমিও সমাজকে পতিত demoralized মনে করি--কিন্তু দয়ার পাত্র মনে করতে পারিনে। আমার জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি আমার সমাজকে মনে করি ভয়ের পাত্র। এ সমাজ সর্ব্বদাই আছে লাঠি উঁচিয়ে; এর দোষ ত্রুটির আলোচনা করতে গেলে নিজের মাথা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়তে হয়্ আপনি হয়ত হাসছেন, কিন্তু আমি ত জানি, আমার শির লক্ষ্য করে কত ইঁট-পাটকেলই না নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

আমার কি মনে হয়, জানেন? স্নেহের হাত বুলিয়ে এ পচা সমাজের কিছু ভাল করা যাবে না। যদি সে-রকম সাইকিক-কিওর-এর শক্তি কারুর থাকে, তিনি হাত বুলিয়ে দেখতে পারেন। ফোঁড়া যখন পে'কে প'চে উঠে, তখন রোগী সবচেয়ে ভয় করে অস্ত্র-চিকিৎসককে। হাতুড়ে ডাক্তার হয়ত তখনো আশ্বাস দিতে পারে যে, সে হাত বুলিয়েই ঐ গলিত ঘা সারিয়ে দেবে এবং তা শুনে রোগীরও খুশী হয়ে উঠারই কথা। কিন্তু বেচারা 'অবিশ্বাসী' অস্ত্র-চিকিৎসক তা বিশ্বাস করে না। সে বের করে তার ধারাল ছুরি, চালায় সে-ঘায়ে অস্ত্র; রোগী চেঁচায়, হাত-পা ছোঁড়ে, গালি দেয়। সার্জ্জন তার কর্ত্তব্য করে যায়। কারণ সে জানে, আজ রোগী গালি দিচ্ছে, দু'দিন পরে ঘা সেরে গেলে সে নিজে গিয়ে তার বন্দনা করে আসবে।

আপনি কি বলেন? আমি কিন্তু অস্ত্র-চিকিৎসার পক্ষপাতী। সমাজ ত হাত-পা ছুঁড়বেই, গালিও দেবে; তা সইবার মত শক্ত চামড়া যাঁদের নেই, তাঁদের দিয়ে সমাজ সেবা হয়ত চলবে না। এই জন্যই আমি বারে বারে ডাক দিয়ে ফিরছি নির্ভীক তরুণ ব্রতীদলকে। এ-সংস্কার সম্ভব হবে শুধু তাঁদের দিয়েই। এরা যশের কাঙাল নয়, মানের ভিখারী নয়। দারিদ্র সইবার মত পেট, আর মার সইবার মতো পিঠ যদি কারুর থাকে, ত এই তরুণদেরই আছে। এরাই সৃষ্টি করবে নতুন সাহিত্য, এরাই আনবে নতুন ভাবধারা, এরই গাইবে তাজা-বতাজার গান।

আপনি হয় ত আমায় এদেরই অগ্রনায়ক হ'তে ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু আপনার মতো আমিও ভাবি, আজো ভাবি যে, কে সে ভাগ্যবান এদের অগ্রনায়ক। আমার মনে হয়, সে ভাগ্যবান আজো আসেনি। আমি অনেক বার বলেছি, আজো বল্‌ছি--সে ভাগ্যবানকে আমি দেখিনি, কিন্তু দেখলে চিনতে পারব। আমার বাণী--তাঁরই আগমনী গান। আমি তারই অগ্রপথিক তুর্য্যবাদক। আমার মনে হয়, সেই ভাগ্যবান পুরুষেরই

ইঙ্গিতে আমি শুধু গান গেয়ে গেয়ে চলেছি--জাগরণী গান। আঘাত, নিন্দা, বিদ্রুপ, লাঞ্ছনা দশদিক হতে বর্ষিত হচ্ছে আমার উপর, তবুও আমি তাঁর দেওয়া তুর্য্য বাজিয়ে চলেছি। এ-বিশ্বাস কোথা হ'তে কি ক'রে যে আমার মাঝে এল, তা আমি নিজেই জানিনে। আমার শুধু মনে হয়, কার যেন আদেশ--কার যেন ইঙ্গিত আমার বেদনার রন্ধ্রপথে নিরন্তর ধ্বনিত হয়ে চলেছে। তাঁর আসার পদধ্বনি আমি নিরন্তর শুনছি আমার হৃৎপিণ্ডের তালে তালে, আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতি আক্ষেপে।

তবে, এও আমি বিশ্বাস করি, সেই অনাগত পুরুষের আমাদের যে কারুর মধ্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করা বিচিত্র নয়।

আমি এতদিন তাঁকে খুঁজেছি আমারও উর্দ্ধে। তাঁকে আমারই মাঝে খুঁজতে হয় তা চেয়েছি। দেখা তাঁর পেয়েছি এমন কথা বলব না, তবে এ-কথা বলতেও আমার আজ দ্বিধা নেই, যে আমি ক্রমেই তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করছি। এমনো মনে হয়েছে কতদিন, যেন আমার একটু হাত বাড়ালেই তাকে ধরতে পারি।

আপনার 'হাত বাড়াবেকি' কথাটা আমায় সত্যিই ভাবিয়ে তুলেছে। তাই আমি খুঁজে ফিরছি নিরাশ হতাশ্বাসে সেই নিশ্চিন্ত শান্তি- যার ধ্যানলোকে বসে আমি তপস্যা-প্রজ্জোল নেত্রে আমার অবহেলিত আমাকে খুঁজে দেখবার অবকাশ পাব। এ শান্তি আমার এ-জীবনে পাব কি না জানি না; যদি পাই--আপনার জিজ্ঞাসার শেষ উত্তর দিয়ে যাব সে-দিন।

আপনার কয়েকটি মৃদু অভিযোগের উত্তর দিতে চেষ্টা করব এইবার।

আপনি আমার যে-দায়িত্বের উল্লেখ করেছেন, সে দায়িত্ব আমার সত্যিকার কাব্য-সৃষ্টির না সমাজ সংস্কারের?

আমি আর্টের সুনিশ্চিত সংজ্ঞা জানিনে, জানলেও মানিনে। "এই সৃষ্টি করলে আর্টের মহিমা অক্ষন্ন থাকে, এই সৃষ্টি করলে আর্ট ঠুঁটো হয়ে পড়ে"- এমনিতর কতকগুলো বাঁধা নিয়মের বলগা ক'সে ক'সে আর্টের গতি পদে পদে ব্যাহত ও আহত করলেই আর্টের চরম সুন্দর নিয়ন্ত্রিত প্রকাশ হল--এ কথা মানতে আর্টিষ্টের হয়ত কষ্টই হয়, প্রাণ তার হাঁপিয়ে উঠে। জানি, ক্লাসিকের কেশো রোগীরা এতে উঠ্‌বেন হাড়ে হাড়ে চটে, তাঁদের কলম হয়ে উঠবে বাঁশ। এরই মধ্যে হয়েও উঠেছে তাই। তবু আজ এ-কথা জোর গলায় বলতে হবে নবীন-পন্থীদেরে। এই সমালোচকদের নিষেধের বেড়া যাঁরাই ডিঙিয়েছেন, তাঁদেরই এদের গোদা পায়ের লাথি খেতে হয়েছে, প্রথম শ্রেণি হতে দ্বিতীয় শ্রেণিতে নেমে যেতে হয়েছে।

বেদনা-সুন্দরের পূজা যাঁরাই করেছেন, তাঁদের চিরকাল একদল লোক হুজুগে ব'লে নিন্দা করেছে। আর, এরাই দলে ভারী। এরা মানুষের ক্রন্দনের মাঝেও সুরতাললয়ের এতটুকু ব্যতিক্রম দেখলে হল্লা করে যে, ও-কান্না হাততালি দেবার মতো কান্না হ'ল না

বাপু, একটু আর্টিষ্টিক ভাবে নেচে নেচে কাঁদ! সকল সমালোচনার ওপরে যে-বেদনা, তাকে নিয়েও আর্টশালারক্ষী এই প্রাণহীন আনন্দ-গুণ্ডার কুশ্রী চীৎকারে হুইটম্যানের মতো ঋষিকেও অ-কবির দলে পড়তে হয়েছিল!

আমার হয়েছে সাপের ছুঁচো-গেলা অবস্থা। 'সর্ব্বহারা' লিখলে বলে কাব্য হ'ল না, 'দোলন চাঁপা', 'ছায়নট' লিখলে বলে--ও হল ন্যাকামি! ও নিরর্থক শব্দ ঝঙ্কার দিয়ে লাভ হবে কী? ও না লিখলে কার কি ক্ষতি হ'ত?

'লিরিক নাকি লভ' এবং ওয়ার নিয়ে। আমাদের দেশে যুদ্ধ নাই (হিন্দু-মুসলমান যুদ্ধ ছাড়া); কাজেই মানুষের নির্যাতন দেখে তার সেই মর্ম্মব্যথার গান গাইলে এখানে হয় তা বীভৎস বিদ্রোহরস। ওটা দিয়ে নাকি মানুষের প্রশংসা সহজ-লভ্য হয় বলেই আজকালকার লেখকরা রসের চর্চ্চা করে।

"আমার লেখা কাব্য হচ্ছে না, আমি কবি নই"- এ বদনাম সহ্য করতে হয় তো কোনো কবিই পারে না। কাজেই যারা করছিল মানুষের বেদনার পূজা, তারা এখন করতে চাচ্ছে প্রাণহীন সৌন্দয্যসৃষ্টি। এমন একটা যুগ ছিল--সে সত্যযুগই হবে হয়ত- যখন মানুষের দুঃখ আজকের মত এতো বিপুল হয়ে ওঠেনি। তখন মানুষ নিশ্চিন্ত নির্ভরতার সঙ্গে ধ্যানের তপোবনে শান্ত সামগান গাইবার অবকাশ পেয়েছে। কিন্তু যেইমাত্র মানুষ নিপীড়িত হতে লাগল, অমনি সৃষ্টি হ'ল বেদনার মহাকাব্য, রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড প্রভৃতি। আর তাতে আমাদের আজকালকার বেঁড়ে ওস্তাদ সমালোচকদের তথাকথিত বীভৎস বিদ্রোহ বা রুদ্র রসের প্রাধান্য থাকলেও--তা কাব্য হয়নি, এমন কথা কেউ বল্‌বে না।

এই বেদনার গান গেয়েই আমাদের নবীন সাহিত্য স্রষ্টাদের জন্য নতুন সিংহাসন গড়ে তুলতে হবে। তারা যদি কালিদাস, ইয়েটস রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি রূপস্রষ্টাদের পাশে বসতে না-ই পায়, পুশকিন, দস্তয়ভস্কি, হুইটম্যান, গর্কি, যোহান বোয়ারের পাশে ধূলির আসনে বসবার অধিকার তারা পাবেই। এই ধূলির আসনই একদিন সোনার সিংহাসনকে লজ্জা দেবে, এই ত আমাদের সাধনা।

দুঃখী বেদনাতুর হতভাগাদের একজন হয়েই আমি বেদনার গান গেয়েছি,--সে গানে হয় তা রূপ-রং ফুটে উঠেনি আমি ভাল রংরেজ নই বলে; কিন্তু সেই বেদনার সুরকে অশ্রদ্ধা করবার মত নীচতা মানুষের কেমন ক'রে আসে। অথচ এই সব গালাগালির বিপক্ষে কোন প্রতিবাদও ত হ'তে দেখি নি।

আজ কিন্তু মনে হচ্ছে, শত্রুর নিক্ষিপ্ত বাণে এতটা বিচলিত হওয়া আমার উচিত হয়নি। আমার দিনের সূর্য্য ওদের শরনিক্ষেপে-- মুহূর্ত্তের তরে আড়াল পড়লেও চিরদিনের জন্য ঢাকা পড়বে না আমার এ বিশ্বাস থাকা উচিত ছিল। কিন্তু এর জন্য দুঃখও করিনে। অন্ততঃ আমি ত জানি, আমার এই ত চলার আরম্ভ, আমার সাহিত্যিক জীবনের এই ত সবে মাত্র সেদিন শুরু। আজই আমি আমার পথের দাবী ছাড়ব কেন?

ওদের রাজপথে ওরা চলতে যদি নাই দেয়, কাঁটার পথেই চলব সমস্ত মারকে সহ্য ক'রে। অন্তত: পথের মাঝ পর্যন্ত ত যাই। আমার বনের রাখাল ভাইরা যে-মালা দিয়ে আমায় সাজাল, সে-মালার অবমাননাই বা করব কেমন ক'রে? ঠিক বলেছ বন্ধু, এবার তপস্যাই করব- পথে চলার তপস্যা।

বিদ্রোহীর' জয়-তিলক আমার ললাটে অক্ষয় হয়ে গেল আমার তরুণ বন্ধুদের ভালোবাসায়। একে অনেকেই কলঙ্ক-তিলক বলে ভুল করেছে, কিন্তু আমি করিনি। মনে হয়, আপনিও এই বিদ্রোহের ভুল মানেটা নিয়েছেন। বেদনা-সুন্দরের গান গেয়েছি ব'লেই কি আমি সত্য-সুন্দরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি? আমি বিদ্রোহ করেছি-বিদ্রোহের গান গেয়েছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে--অত্যাচারের বিরুদ্ধে-যা মিথ্যা, কলুষিত, পুরাতন, পচা--সেই মিথ্যা-সনাতনের বিরুদ্ধে, ধর্ম্মের নামে ভণ্ডামী ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। হয়ত আমি সব কথা মোলায়েম করে বলতে পারিনি, তলোয়ার লুকিয়ে তার রূপার খাপের ঝকমকানিটাকেই দেখাইনি--এই তো আমার অপরাধ। এরই জন্য ত আমি বিদ্রোহী। আমি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি, সমাজের সকল কিছু কুসংস্কারের বিধিনিষেধের বেড়া অকুতোভয়ে ডিঙিয়ে গেছি এর দরকার ছিল মনে করেই।

যাক। আগেই বলেছি, এ কুম্ভকর্ণমার্কা সমাজকে জাগাতে হলে আঘাত দিয়েই জাগাতে হবে। একদল প্রতিক্রিয়াশীল বিদ্রোহীর উদ্ভব না হ'লে এর চেতনা আসবে না। কুম্ভকর্ণের পায়ে সুড়সুড়ি দিয়ে বা চিমটি কেটে এর ঘুম কেউ ভাঙতে পারবে না। রামায়ণে কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙাবার যে-সব পলিসির উল্লেখ আছে, তা একেবারে মোলায়েম নয়। সেই পলিসিই একবার একটু পরখ করে দেখুকই না ছেলেরা! এতে কি আর এমন হবে! আপনি বলবেন, কুম্ভকর্ণ না হয় জাগ্‌ল ভায়া, কিন্তু জেগে সে যে-রকম 'হাঁ' টা করবে, সে 'হাঁ' ত সঙ্কীর্ণ নয়! তখন? আমি বলি কি, তখন কুম্ভকর্ণ তাদেরই ধ'রে 'জলপানি' করবে, যারা তাঁর ঘুম ভাঙাতে গিয়েছিল।

এতই ত মরছে, না হয় আরো দু'দশটা মরবে। আপনি বল্‌বেন, ভয় ত ঐখানেই বন্ধু, বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধতে এগোয় কে? আমি বলি, সে দুঃসাহস যদি আমাদের কারুর না থাকে, তা হ'লে নিশ্চিত হ'য়ে নাকে সর্ষের তেল দিয়ে সকলে 'আসহাব কাহাফে'র মত রোজ-কিয়ামত ক ঘুমোতে পারেন। সমাজকে জাগাবার আশা একেবারেই ছেড়ে দিন! কারুর পান থেকে এতটুকু চুণ খস্‌বে না, গায়ে আঁচড়টা লাগ্‌বে না, তেল্‌-কুচ্‌ কুচে নাদুস-নুদুস ভূড়িও বাড়বে এবং সমাজও সাথে সাথে জাগতে থাকবে--এ আশা আলেম সমাজ করতে পারেন, আমরা অবিশ্বাসীর দল করিনে।

আমার কথাগুলো 'মরিয়া হইয়া'র মত শুনাবে, কিন্তু বড় দুঃখে দেখে শুনে তেতোবিরক্ত হয়ে এ-সব বলতে হচ্ছে। তাই ত বলি যে, বাবা! তোকে রামে মারলেও মারবে, রাবণে মারলেও মারবে। মরতে হয় ত এদেরই একজনের হাতে মর্‌ বেশ একটু হাতা হাতি করে; তাতে সুনাম আছে। কিন্তু ঐ হনুমানের হাতে মরিস কেন? হনুমানের

হাতে মরার চেয়ে বরং কুম্ভকর্ণকে জাগাতে গিয়ে মরা ঢের ভাল। কথাগুলো যখন বলি, তখন লোকে হাততালি দেয়, 'আল্লাহ আকবর' 'বন্দেমাতরম্‌' ধ্বনিও করে; কিন্তু তারপর আর তাদের খবর পাইনে।

আমিও মানি, গড়ে তুলতে হলে একটা শৃঙ্খলার দরকার। কিন্তু ভাঙ্গার কোনো শৃঙ্খলা বা সাবধানতার প্রয়োজন আছে মনে করিনে। নতুন করে গড়তে চাই বলেই ত ভাঙি--শুধু ভাঙার জন্যই ভাঙার গান আমার নয়। আর ঐ নতুন ক'রে গড়ার আশাতেই ত যত শীঘ্র পারি ভাঙি--আঘাতের পর নির্ম্মম আঘাত হেনে পচা পুরাতনকে পাতিত করি। আমিও জানি, তৈমুর নাদির সংস্কার প্রয়াসী হ'য়ে ভাঙতে আসেনি, ওদের কাছে নতুন-পুরাতনের ভেদ ছিল না। ওরা ভেঙেছিল সেরেফ ভাঙার জন্যই। কিন্তু বাবর ভেঙেছিল দিল্লী-আগ্রা-ময়ুরাসন-তাজমহল গড়ে তোলার জন্য। আমার 'বিদ্রোহও যখন চাহে এ মন যা'র বিদ্রোহ নয়, ও আনন্দের অভিব্যক্তি সর্ব্ববন্ধনমুক্তির--পূর্ণতম স্রষ্টার।

আপনার 'মুসলিম-সাহিত্য' কথাটার মানে নিয়ে অনেক মুসলমান সাহিত্যিকই কথা তুলবেন হয়ত। ওর মানে কি মুসলমানের সৃষ্ট সাহিত্য, না মুসলিম ভাবাপন্ন সাহিত্য? সাহিত্য যদি সত্যিকার সাহিত্য হয়, তবে তা সকল জাতিরই হবে। তবে তার বাইরের একটা ফর্ম্ম থাকবে নিশ্চয়। ইসলাম-ধর্ম্মের সত্য নিয়ে কাব্যরচনা চলতে পারে, কিন্তু তার শাস্ত্র নিয়ে চলবে না; ইসলাম কেন, কোন ধর্ম্মেরই শাস্ত্র নিয়ে কাব্য লেখা চলে ব'লে বিশ্বাস করি না। ইসলামের সত্যকার প্রাণশক্তি গণতন্ত্রবাদ, সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সমানাধিকারবাদ।

ইসলামের এই অভিনবত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব আমি ত স্বীকার করিই, যাঁরা ইসলাম-ধর্ম্মাবলম্বী নন, তাঁরাও স্বীকার করেন। ইসলামের এই মহান সত্যকে কেন্দ্র ক'রে কাব্য কেন, মহাকাব্য-সৃষ্টি করা যেতে পারে। আমি ক্ষুদ্র কবি, আমার বহু লেখার মধ্য দিয়ে আমি ইসলামের এই মহিমা-গানই করেছি। তবে কাব্যকে ছাপিয়ে ওঠেনি সে-গানের সুর। উঠতে পারেও না। তা হ'লে তা কাব্য হবে না। আমার বিশ্বাস, কাব্যকে ছাপিয়ে উদ্দেশ্য বড় হয়ে উঠলে কাব্যের হানি হয়। আপনি কি চান, তা আমি বুঝতে পারি--কিন্তু সমাজ যা চায়, তা সৃষ্টি করতে আমি অপারগ। তার কাছে এখনও–

"আল্লা আল্লা বল রে ভাই নবী কর সার
মাজা দুলিয়ে পারিয়ে যাবে ভবনদীর পার"

রীতিমত কাব্য! বুঝবার কোনো কষ্ট হয় না, আল্লা বলতে এবং নবীকে সার করতে উপদেশও দেওয়া হ'ল, মাজাও দুলল এবং ভবনদী পারও হওয়া গেল। যাক, বাঁচা গেল--কিন্তু বাঁচল না কেবল কাব্য! সে বেচারী ভবনদীর এ-পারেই রইল পড়ে। ঝগড়ার উৎপত্তি এইখানেই। কাব্যের অমৃত যারা পান করেছে, তারা বলে--মাজা যদি দুলাতেই হয় দাদা, তবে ছন্দ রেখে দুলাও; পারে যদি যেতেই হয়, তবে তরী একেবারে কমল-বনের ঘাটে ভিড়াও। অমৃত যারা পান করেনি-আর এরই শতকরা নিরানব্বই

জনতারা--বলে, কমল-বন টমল-বন জানিনে বাবা, সে যদি বাঁশবন হয়, সেওভি আচ্ছা- কিন্তু একেবারে ভবনদীর পারঘাটায় লাগাও নৌকা। এ অবস্থায় কি করব, বল্‌তে পারেন? আমি 'হুজ্জতুল ইসলাম' লিখব, না সত্যিকার কাব্য লিখব?

এরা যে শুধু হুজ্জ্বতুল ইসলামই পড়ে, এ আমি বলব না;--রসজ্ঞানও এদের অপরিমিত। আমি দেখেছি, এরা দল বেঁধে পড়ছে,--

"ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ্দ হাঁটিয়া চলিল"
অথবা
"লাখেলাখে ফৌজ মরে কাতারে কাতার
শুমার করিয়া দেখি পঞ্চাশ হাজার"

আর এই কাব্যের চরণ প'ড়ে কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছে। উম্মর উম্মিয়ার প্রশংসায় রচিত-

"কাগজের ঢাল মিঞার তালপাতার খাঁড়া
আর লড়ির গলায় দড়ি দিয়ে বলে চল হামারা ঘোড়া"

পড়তে পড়তে আনন্দে গদগদ হয়ে উঠেছে।

বিদ্রূপ আমি করছিনে বন্ধু, এ আমার চোখের জলজমানো হাসির শিলাবৃষ্টি!

সত্যসত্যই আমার লেখা দিয়ে যদি আমার মুমূর্ষু সমাজের চেতনা সঞ্চার হয়, তা হ'লে তার মঙ্গলের জন্য আমি আমার কাব্যের আদর্শকেও না হয় খাটো করতে রাজি আছি; কিন্তু আমার এ ভালোবাসার আঘাতকে এরা সহ্য করবে কি না, সেইটাই যে বড় প্রশ্ন। হিন্দু লেখকগণ তাঁদের সমাজের গলদ-ত্রুটী-কুসংস্কার নিয়ে কি না কশাঘাত করেছেন সমাজকে;-তা সত্ত্বেও তাঁরা সমাজের শ্রদ্ধা হারাননি। কিন্তু হতভাগা মুসলমানের দোষ-ত্রুটির কথা পর্যন্ত বলবার উপায় নেই। সংস্কার ত দূরের কথা, তার সংশোধন করতে চাইলেও এরা তার বিকৃত অর্থ করে নিয়ে লেখককে হয় ত ছুরীই মেরে বসবে! আজ হিন্দুজাতি যে এক নবতম বীর্য্যমান জাতিতে পরিণত হ'তে চলেছে, তার কারণ তাদের অসমসাহসিক সাহিত্যিকদের তীক্ষ্ণ লেখনী।

আমি জানি যে, বাঙলার মুসলমানকে উন্নত করার মধ্যে দেশের সব চেয়ে বড় কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এদের আত্ম-জাগরণ হয়নি ব'লেই ভারতের স্বাধীনতার পথ আজ রুদ্ধ।

হিন্দু মুসলমানের পরস্পরের অশ্রদ্ধা দূর করতে না পারলে যে এ পোড়া দেশের কিছু হবে না, এ আমিও মানি। এবং আমিও জানি যে, একমাত্র সাহিত্যের ভিতর দিয়েই এ-অশ্রদ্ধা দূর হ'তে পারে। কিন্তু ইসলামের সভ্যতা-শাস্ত্র ইতিহাস' এ-সমস্তকে কাব্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা দুরূহ ব্যাপার নয় কি?

আমার মনে হয়, আমাদের নতুন সাহিত্যব্রতীদল এই এক একটা দিক নিয়ে রিসার্চ্চ ও আলোচনার দায়িত্ব নিলে ভাল হয়। আগেই বলেছি, নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রার পূর্ণ

শান্তি কোন দিন পাইনি। যদি পাই, সে-দিন আপনার এই উপদেশ বা অনুরোধের মর্য্যাদা রক্ষা যেন করতে পারি– তাই প্রার্থনা করছি আজ।

আবার বলি, যাঁরা মনে করেন- আমি ইসলামের বিরুদ্ধবাদী বা তার সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছি, তাঁরা অনর্থক এ-ভুল করেন। ইসলামের নামে যে সব কুসংস্কার মিথ্যা আবর্জ্জনা স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে- তাকে ইসলাম বলে না-মানা কি ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযান? এ-ভুল যাঁরা করেন, তাঁরা যেন আমার লেখাগুলো মন দিয়ে পড়েন দয়া করে-এ ছাড়া আমার আর কি বলবার থাকতে পারে?

আমার বিদ্রোহী প'ড়ে যাঁরা আমার উপর বিদ্রোহী হয়ে উঠেন, তাঁরা যে হাফেজ-রুমীকে শ্রদ্ধা করেন-এ-ও আমার মনে হয় না। আমি ত আমার চেয়েও বিদ্রোহী মনে করি তাঁদের। এঁরা কি মনে করেন, হিন্দু দেব-দেবীর নাম নিলেই সে কাফের হয়ে যাবে? তা হ'লে মুসলমান কবি দিয়ে বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টি কোনো কালেই সম্ভব হবে না--'জৈগুন বিবি'র পুঁথি ছাড়া। বাঙলা সাহিত্য সংস্কৃতের দুহিতা না হলেও পালিতা কন্যা। কাজেই তাতে হিন্দু-ভাবধারা এমন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত যে, ও বাদ দিলে বাঙলার ভাষায় অর্দ্ধেক ফোর্স নষ্ট হয়ে যাবে। ইংরেজী সাহিত্য হতে গ্রীক পুরাণের ভাব বাদ দেওয়ার কথা কেউ ভাবতে পারে না। বাঙলা-সাহিত্য হিন্দু-মুসমানের উভয়েরই সাহিত্য। এতে হিন্দু দেব-দেবীর নাম দেকলে মুসলমানের রাগ করা যেমন অন্যায়, হিন্দুরও তেমন মুসলমানের দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্যে নিত্য প্রচলিত মুসলমানী শব্দ তাদের লিখিত সাহিত্যে দেখে ভুরু কোঁচকানো অন্যায়। আমি হিন্দু-মুসলমানের মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী। তাই তাদের এ সংস্কারে আঘাত হানার জন্যই মুসলামনী শব্দ ব্যবহার করি বা হিন্দু-দেব-দেবীর নাম নিই। অবশ্য এর জন্য অনেক জায়গায় আমার কাব্যের সৌন্দর্য-হানি হয়েছে। তবু আমি জেনে-শুনেই তা করেছি।

কিন্তু বন্ধু এ-কর্ত্তব্য কি একা আমারই? আমার শক্তি সম্বন্ধে আপনার যেমন বিশ্বাস, আপনার ওপরও আমার সেই একই বিশ্বাস-একই শ্রদ্ধা। আপনিও 'কামাল পাশা' না লিখে এই হতভাগ্য মুসলমানদের জীবন নিয়ে নাটক লিখতে আরম্ভ করুন না কেন। আমার মনে হয়, ওদিকে আপনার জুড়ি নেই, অন্ততঃ আমাদের মধ্যে কেউ! 'কামাল পাশা'র দরকার আছে জানি, কিন্তু তার চেয়েও দরকার- আমাদের চোখের সামনে আমাদেরই জীবনের এই ট্যাজেডি তুলে ধরা। কবিতা ও প্রবন্ধ-লেখকের আমাদের অভাব নেই। নাটক লিখিয়ের অভাব আপনার দিয়ে পূরণ হতে পারে। আমাদের সব চেয়ে বড় অভাব--কথা--সাহিত্যিকের। এর ত কোনো আশা-ভরসাও দেখছিনে কারুর মধ্যে। অথচ কথা-সাহিত্য ছাড়া শুধু কাব্যের মধ্যে আমাদের জীবন, আমাদের আদর্শকে ফুটিয়ে তুলতে কেউ পারবেন না। অনুবাদের দিক দিয়েও আমরা সব চেয়ে পিছনে। সঙ্গীত, চিত্রকলা, অভিনয় ইত্যাদি ফাইন আর্টের কথা না-ই বললাম।

এত অভাবের কোন্ অভাব পূর্ণ করব আমি একা, বন্ধু! অবশ্য একাই হাত দিয়েছি অনেকগুলো কাজে;- তাতে করে হয়ত কোনোটাই ভাল করে হচ্ছে না।

জীবন আমার যত দুঃখময়ই হোক, আনন্দের গান–বেদনার গান গেয়ে যাব আমি, দিয়ে যাব আমি নিজেকে নিঃশেষ ক'রে সকলের মাঝে বিলিয়ে, সকলের বাঁচার মাঝে থাকব আমি বেঁচে। এই আমার ব্রত, এই আমার সাধনা, এই আমার তপস্যা।

আপনার এত সুন্দর, এমন সুলিখিত চিঠির কি বিশ্রী ক'রেই না উত্তর দিলাম! ব্যথা যদি দিয়ে থাকি আমার গুছিয়ে বলতে না পারার দরুণ, তা'হলে আমি ক্ষমা না চাইলেও আপনি ক্ষমা করবেন- এ বিশ্বাস আমার আছে।

আমার বিরাট আশা ক্ষুদ্র আমার মাঝে পূর্ণ যদি না-ই হয়, তবে তা আমাদেরই আর কারুর মাঝে পূর্ণত্ব লাভ করুক, আমি কায়মনে এই প্রার্থনা করি।

-নজরুল ইসলাম

উপরোক্ত চিঠি সম্বন্ধে ইতোপূর্বে আলোকপাত করেছি। এখানে শুধু বলতে চাই পৃথিবীতে যে দু'একজন মহৎ চিঠি লেখক রয়েছেন, নজরুল নিশ্চয়ই তাঁদের মধ্যে অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের চিঠি আমরা পড়েছি, সে গুলো চিঠি না হয়ে অন্যতম কাব্যিক গদ্য হয়েছে। কিন্তু চিঠির মধ্যে নজরুল যে Wit এবং Humour প্রয়োগ করেছেন এবং তাঁর চিঠি যে আপনাতেই এক অসাধারণ শিল্পকর্ম হয়েছে তা সকলেই স্বীকার করবেন। চিঠির ভাষার যে শৈল্পিক নৈপুন্যতা যার মাধ্যমে কবি তাঁর বক্তব্য অসাধারণ ব্যঙ্গরসে সমৃদ্ধ করেছেন - তা কেবল আস্বাদে নিরবে শ্রীবৃদ্ধি ঘটায়- তার বুঝি শেষ নেই। চিঠির ইতিহাসে এর জুড়ি নেই।

ঢাকায় হিন্দু যুবকদের দ্বারা নজরুল আক্রান্ত

কলকাতায় বসে নজরুল সাহিত্য চর্চা করলেও তাঁর খ্যাতি সমগ্র বাংলাদেশ ছড়িয়ে গিয়েছিল। এ সময়ে তিনি রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সঙ্গেও সম্পৃক্ত হন। ১৯১৬ সালের জুন মাসের শেষের দিকে নজরুল তাঁর বন্ধু হৈমন্ত কুমার সরকারকে নিয়ে সর্বপ্রথম ঢাকায় আসেন। ২৭শে জুন 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র অনুষ্ঠানে ভাষণ এবং সেখানে বেশ কয়েকটা গান পরিবেশন করেন। নজরুলের ঢাকায় আসবার অন্যতম কারণ ছিল হিন্দু-মুসলিম সম্প্রতি। নজরুল লক্ষ্য করেছিলেন বৃটিশ নানা কৌশলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটি বিরোধ সৃষ্টি করে দিয়েছে। সে সময় কয়েক স্থানে সাম্প্রদায়িক লক্ষ্য করেছিলেন বৃটিশ নানা কৌশলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটি বিরোধ সৃষ্টি করে দিয়েছে। সে সময় কয়েক স্থানে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা দেখা দিয়েছিল। নজরুল বুঝেছিলেন, বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের জন্য হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি অত্যাবশ্যক। তাঁর কান্ডারী হুশিয়ার গানটি তখন সমস্ত বাঙালীর মনে দারুণ উৎসাহ সৃষ্টি করেছিল। তথাপি নজরুলের মনে হয়েছিল যে তাঁকে প্রত্যক্ষ ভাবে জনগণের সঙ্গে মিশে তাঁদেরকে সম্প্যতির জন্য উদ্যোগী করে তুলতে হবে। এই মনে করেই তিনি ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট প্রভৃতি এলাকা পরিভ্রমণ করেন। অত:পর ১৯২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যশোর খুলনা সফর করেন।

১৯২৭ সালে নজরুল ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েন। অত:পর কারামুক্ত হলে তিনি ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজের আহবানে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। হাজার হাজার মানুষ সেদিন নজরুলকে বরণ করে নিয়েছিলেন। এ সময় হিন্দুদের মধ্যেও সাড়া পড়েছিল তাঁরাও তাঁকে পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

এই সময় কবি সুফিয়া কামাল (সুফিয়া এন হোসেন) খবরের কাগজে একটি সংবাদ পড়ে দেখেন যে ঢাকায় কারা নাকি নজরুলকে আক্রমণ করে মারধোর পর্যন্ত করেছে। এই সংবাদে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে 'সওগাত' সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনকে একটি পত্র লেখেন। ১৪/১ সারেং লেন কলিকাতা থেকে ৪ঠা জুলাই ১৯২৭ এই পত্রটি লেখা হয়।

সুফিয়া কামাল চিঠিতে উল্লেখ করেন : "বর্তমান সময়ে ওর (নজরুলের) একটা মান-সম্মানে আমাদের সমস্ত মোসলেম সমাজের মান-সম্মান জড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে আমলাদের আরো। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একশ্রেণীর লোক আমাদের সমাজে আছেন বটে কিন্তু তাঁরা শুধু অহং-ই। এরা নিজের অঙ্গে একটু আঘাত পেলে ওই করবেন কিন্তু সমাজ কিংবা জাতীয় কোন কাজে এঁদের কোন টান নেই, এটা আপনি ভালই জানেন। নয়ত আমাদের বাঙ্গালী মোসলেম জাতির মধ্যে একটিমাত্র সাহিত্য জগতের আশাপ্রদীপ ওই কাজী, ওর কি এমনি হেলার দশা হয় ককনো ? এমন কেউ নেই যে ওকে আপন বলে স্বীকার করে। তাই-ত তার এ দশা।

আজ যদি বেঁচে থাকতেন মিসেস এম রহমান, মায়ের কোলে শিশুর মতোই শান্তি তে কাজী থাকতে পারত কিন্তু ওটার দুর্ভাগ্য, তাই মা পেয়েও মা হারাল। এখন পর্যন্ত আর মিসেস রহমানের মতো একটি মা জন্মালোনা এই আমাদের সমাজে। বোনত জন্মাতে পারত। কিন্তু তা হবার নয়। ভাই? তাও কি হতে পারে না? বোধ হয় তা পারে।... ....

অত:পর এই চিঠির এক জায়গায় তিনি আরো লেখেন : আমার স্বামী এখন পরিক্ষা নিয়ে ব্যস্ত আছেন, নয়ত ওঁকে দিয়ে কাজীর খোঁজ নেওয়াতুম। আপনাকে শুধু এ বিষয়ে অনুরোধ করতে পারি। আপনি ওকে দেখবেন। ওর মা হয়ে বোন হয়ে আপনাকে অনুরোধ করছি। হতভাগাটাকে পথ থেকে এনে স্নেহ দিয়ে ওকে বাঁধুন। এ দুরন্ত শাসনে সায়েস্তা হবেই না। যদি কোনো রকমে তাকে ধরে বেঁধে কোলকাতা আনতে পারেন তবেই রক্ষা।.....

তাঁর মা-ও মারা গেছেন শুন্‌লাম। এখন কাজী কোথায় আছে ও তাঁর স্ত্রী পুত্র কোথায় আছে, অনুগ্রহ করে সত্বর জানাবেন। কি কি ঘটনা হলো আমাকে জানাবেন। ওর মা বেঁচে থাকলে হয়ত এমনি অধীর আগ্রহে আকুল অনুরোধ জানাতেন আপনাকে, আমিও জানাচ্ছি। আমি কাজীর বোন, আমাকে অনুগ্রহ করে কষ্ট স্বীকার করে সব কথা

জানাবেন ও তাঁর দিকে একটু খেয়াল করবেন। রবীন্দ্রনাথের পরে আর এক রবীন্দ্রনাথ হয়ত হবে কিন্তু কাজী নজরুল ইসলাম আর হবে না।"

কী অসাধারণ দরদ ভরা কবি। নজরুল এমনি করে সেদিন সকলের মন জয় করেছিলেন। এই চিঠিটিও তাঁর জনপ্রিয়তার এক ঐতিহাসিক দলিল। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন এই চিঠি পাবার পর বলেন: "আমি সুফিয়ার চিঠিখানা পড়ে বিমুগ্ধ ও বিশেষ লজ্জিত হলাম। সত্যিই তো আজ পর্যন্ত কোনো মুসলমান সাহিত্যিক বা অন্য কেউ এরূপ দরদ দিয়ে নজরুলের দু:সময়ে তাঁর জন্যে কিছু বলেন নি।"

ঢাকায় নজরুলকে মারধোর করে অপমানের বিষয়টি নিয়ে কবি সুফিয়া কামাল যে চিঠিটি 'সওগাত' সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিনকে লিখেছিলেন তার তারিখ ছিল ১৯২৭ জুলাই।

বিভিন্ন গ্রন্থাদি পাঠ করে জানা যায় যে ১৯২৭ সালে এমন ধররেন কোন ঘটে নি। তবে ঘটনাটি ঘটেছিল ২৫ জুলাই ১৯২৮ সালে। নজরুল ইতোপূর্বে ১৯২৬ ও ১৯১৭ সালে বারকয়েক ঢাকায় এসেছেন এবং জনগণদের দ্বারা সংবর্ধিত হয়েছেন। ১৯২৮ সালে দু'বার তিনি ঢাকায় এসেছেন। এই প্রথম জুন মাসে নজরুল রানু সোম ওরফে প্রতিভা বসু (পরবর্তীতে বুদ্ধদেবের স্ত্রী) এবং ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ সুরেন্দ্র মৈত্র ও তার কন্যা নোটন ওরফে উমা মিত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন। এ সময় বারকয়েক নজরুল রানু সোমদের বাড়ীতে গিয়েছেন এবং সেখানে তিনি রানু সোমকে নিয়মিত গানও শিখিয়েছেন।

রানু সোমের স্মৃতিতে নজরুল ঃ

এ বিষয়ে রানু সোম তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন : "থাকি ঢাকা শহরে, বয়েস তখন তেরো, এই সময়ে একবার বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ এবং সাহিত্যিক দিলীপ কুমার রায় এলেন সেখানে। উঠেছেন তাঁর বন্ধু বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বাড়ী রমনায়। ঢাকা গান পাগল দেশ। গায়কেরও অভাব নেই, সমজদারেরও অভাব নেই। সেই সময় সারা বাংলা যে তিনটি নামের জোয়ারে ভেসে যাচ্ছিলো তাঁর একজন সঙ্গীতজ্ঞ দিলীপ কুমার রায়, আর একজন রাজনীতিবিদ সুভাষ চন্দ্র বসু। অন্যজন কাজী নজরুল ইসলাম।

দিলীপ কুমার রায়কে নিয়ে মেতে উঠলো শহর। নানা জায়গায় তাঁর গানের আসর বসতে লাগলো। আমারও ডাক পড়তে লাগলো ঘন ঘন। যেহেতু আমার কিছু গানের রেকর্ড বেরিয়ে গেছে ততোদিনে দিলীপ কুমার আমার নামই জানতেন। রেকর্ডও শুনেছেন, সহজেই তাঁর সঙ্গে আমার গুরু শিষ্যের সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেলো। তিনিই আমাকে নজরুলের গানে হাতেখড়ি দিলেন এবং সেই গান শুনে শ্রোতারা পাগলের মতো মোহিত হতে লাগল। নজরুল দুরবর্তীর হৃদয়েতো বটেই। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের হৃদয়তন্ত্রীকেও যথেষ্ট জোরে ঘা দিল।

নজরুল ইসলাম শুধু গানের অভিনবত্বের জন্যই বা কম্পোজার হিসেবেই নয়, তিনি এক যুগান্তকারী বিদ্রোহী নেতাও, তাঁর পাগলী হয়কে স্বাধীনতার স্পৃহায় ওদ্বুদ্ধ করে, প্রজ্জ্বলিত করে। দলে দলে ছেলে মেয়েরা বেরিয়ে আসে সেই কবিতার ডাকে। একই উল্কার মতো মানুষ। সেই মানুষ বিষয়ে আমাকে দীক্ষিত করে কিছুকাল বাদে দীলিপ কুমার চলে গেলেন। তার চলে যাওয়া আমার উজ্জ্বল দিন-রাত্রিকে অনেকখানিই নিস্প্রভ করে দিয়েছিল।

কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই কোন এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যঅয় আমাদের বাড়ীর দরজায় একটা ঘোড়ার গাড়ী থামলো। ঢাকাতে ঘোড়ার গাড়ীতে করে। কেউ আসা মানেই পরিবার নিয়ে বেড়াতে আসা। নইলে ঢাকার পুরুষেরা সকলেই পদাতিক অথবা সাইকেল আরোহী। মহিলা হলেই গাড়ীর প্রশ্ন। মফ:স্বল শহরের সব সন্ধ্যাই বড় বিরস। সেই বিরস সন্ধ্যায় বিরস মুখে আমি আমাদের দোতালা বাড়ীর রাস্তার ধারের ঝোলানো বারান্দায় ঠেস দিয়া দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখছিলাম। দূরে টিমটিমে গ্যাসের আলোয় পথও বিরস। তারই মধ্যে একটি গাড়ী থেমে কোনো অতিথির আগমন ঘোষণা করে আমাকে যথেষ্ট খুশী করলো। আমি দৌড়ে নীচে এলাম।

মা বললেন, 'ছুটছিস কেন? কী ব্যাপার? তেমনি দৌড়েই সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললাম কারা যেন ঘোড়ার গাড়ী করে বেড়াতে এলেন আমাদের বাড়ী।'

তা একটা আলো নিয়ে যা, পুনার মাকে (আমাদের পরিচারিকা) ডেকে বল লণ্ঠনটা দিতে।' পুনার মাকে ডাকতে হলো না, এক তলায় আসতে সে নিজে থেকেই লণ্টনটা হাতে দিল। আমি সেটাই দিলে যেয়ে দরজা খুলে দিলাম। খুলে দিয়েই দেখলাম বাঙালির তুলনায় অতিশয় সুস্থ এবং সুশ্রী এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছেন দরজায়। এঁকে আমি বারান্দা থেকেই নামতে দেখেছিলাম। এক মুখ হেসে আমাকে প্রায় ঠেলেই ঢুকে এলেন ঘরে। আমি হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'এইতো, এইতো তুমি। তুমিই রানু, ঠিক তো ? তুমিই মন্টুর ছাত্রী।' মন্টু দিলীপ কুমার রায়ের ডাক নাম।

আমার বুকটা ঠক করে কেঁপে উঠলো, মনে মনে বললাম, তবে কি ইনিই তিনি?

আমি নজরুল ইসলামকে কখনও দেখিনি, কখনও তাঁর চেহারার কোনো বর্ণনাও শুনিনি, তবু খুব আশ্চর্য ভাবেই মনে হলো এঁর নামই নজরুল ইসলাম। যে নাম আমি দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করি, যাঁর বিপ্লবাত্মক, দেশাত্মবোধক এবং গজলের মিষ্টি সুর সংবলিত প্রেমের গান গেয়ে আমি রাতারাতি ঢাকা শহরে একটা নাম হয়ে উঠেছি। আমি রোমাঞ্চিত বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকে বললাম, আপনি– আপনি কি–' 'আমি নজরুল ইসলাম।' বড়ো বড়ো গলায় হাসলেন।

নজরুল ইসলামের বয়স তখন তিরিশ বত্রিশ অথবা তারও কিছু বেশি কিনা আমি জানি না। যৌবন তাঁর চোখে মুখে সমস্ত শরীরে নদীর স্রোতের মত বহমান এবং বেগবান। সেই বয়েসে তাঁকে যাঁরা দেখেছেন শুধু তাঁদেরই বোঝানো যাবে কী

দুকুলপ্লাবী আনন্দধারা দিয়ে গড়া তাঁর চরিত্র। আমার মতো একটা নগন্য সদ্য কিশোরীর জীবনে এই বিরাট ব্যক্তির উপস্থিতি সেদিন যে প্রচন্ড সুখ এবং সম্মান এনে দিয়েছিলো তার কোনো তুলনা নেই।

উনিই যে নজরুল ইসলাম সেটা যে দেখামাত্রই বুঝেছিলাম তার সবটাই আমার ইনট্যুইশন তা নয়। দিন দুই আগে জনরব শুনেছি তিনি ঢাকা এসেছেন, ছাত্ররা নাকি ভেঙ্গে পড়েছে তাঁর দরবারে। কেবলমাত্র গানেই নয়, ঢাকার মানুষ বিশেষত ছাত্র ছাত্রীরা রাজনীতিতেও প্রবল উৎসাহী। এই ব্যক্তিটিই নানা কারণেই তাই নানা মানুষের কাছে এক কল্পনার নায়ক। বস্তুতই এমন একজন নায়ক কোনো দেশে কোনো কালেই অবিরল নয়। মস্ত বড়ো বড়ো টানা কালো চোখ, এলোমেলো ঘন চুলের বাবরি, তীক্ষ্ম নাসিকা, ঘষা তামার মতো রঙ লাবণ্য, সহজ সরল অদাম্ভিক ব্যবহার, উদ্দাম হাসি, উচ্ছ্বাস প্রবণতা– সবটা মিলিয়ে একটা ব্যক্তিত্ব বটে। আর তার ধুলোয় লুটিয়ে পড়া গেরুয়া বাদর।

ঢাকা আসার গল্পটিও ঠিক তার চরিত্র উপযোগীই ছিলো। ফুটবল খেলা দেখতে গিয়েছিলেন গড়ের মাঠে। ইষ্টবেঙ্গল আর মোহন বাগান নিয়ে তুমুল তর্ক করতে করতে কোনো বন্ধুর পাল্লায় পড়ে শিয়ানদা স্টেশনে এসে হাজির। দেখলেন, ঢাকা মেইল দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ মনে হলো একবার গিয়ে বেরিয়ে এলে কেমন হয়? এইতো মন্টু যেমন ঘুরে এলো। মনে হওয়া আর টিকিট কাটা। ব্যস, উঠে বসলেন।

আমি বিহবলতা কাটিয়ে দেখলাম মা এসে দাঁড়িয়েছেন, বাবাও নেমে এসেছেন ছাঁদ থেকে। নজরুল ইসলাম নিজেই আপ্যায়ন করছেন তাদের, আসুন, আসুন, আপনাদের কথা আমি সব শুনেছি। মন্টুর কাছে। এসে থেকে বলছি সেই পাখির গলা মেয়েটির কাছে নিয়ে যাও আমাকে, কেবল এদিক ওদিক নিয়ে যায় আর ভিড় করে। তাই আজ ঠিকানা খুঁজে নিজেই চলে এলাম।

এই মানুষের আগমনে আমার মা-বাবাও কম বিহবল হন নি। তাতে কি? নজরুল তো একাই একশো। মুহূর্তের মধ্যে সকলের সব সংকোচ ধুয়ে মুছে হাসিতে গানেতে গানেতে মশগুল করে তুললেন আসর। বসার ঘর থেকে উঠে এলাম দোতলায়। নজরুল ইসলামের স্মৃতি মানেই হাতে হারমোনিয়াম, বাটাভরা পান, আর ঘন ঘন চা। সেই হারমোনিয়াম নেমে এলো বাসা থেকে, বাটা ভরা পানও এলো, চাও এলো ঘটভর্তি। তারপর গান, গান আ রগান। আমাকে দিয়েও গাওয়াচ্ছেন, নিজেও গাইছেন, সঙ্গে সঙ্গে অনর্গল হাসি। মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠছেন, 'দে গরুর গা ধুইয়ে।' আমি গানে টান দিলেই বলে উঠছেন 'আভালন আভালন।'

তাঁর নিজের গলা ভাঙা ভাঙা, কিন্তু কী মিষ্টি, কি স্বর্গীয়। সেদিনই শেখানো শুরু হয়ে গেল। উঠলেন রাত দশটায়। চলে যাবার পরেও অনেকক্ষণ একটা তদগত আনন্দের সতেজ হাওয়ায় ভরে থাকলো বাড়িটা।

পরেরদিন সকালেই আবার দেখি চলে এসেছেন। আমি সবে ঘুম থেকে উঠে হাই তুলতে তুলতে মুখ ধুয়ে এলাম। মা আমাদের চা দিচ্ছেন, এই সময় কড়া নাড়া। আমরা তো অবাক। প্রচন্ড হাসি, 'এসে পড়লাম, বুঝলে? বেলা পড়তে দিলে কি আর উপায় আছে? সব ছেলেরা ঠিক ভিড় করবে। ধরে নিয়ে যাবে কোথাও। এখান থেকে ফিরে গিয়ে কাল রাত্রিরে একটা গান লিখেছি, এক্ষুণি শিখিয়ে দিতে হবে। নাও, নাও শিগগির চা খেয়ে নাও। আবার ভুল হয়ে যাবে।

চায়ের আসরে তিনিও বসে গেলেন। সকালটাই উজ্জল হয়ে উঠলো। তারপর আবার হারমোনিয়াম, পানের বাটা আর গান। 'আমার কোন কূলে আজ ভিড়লো তরী এ কোন সোনার গায়, আমার ভাটির তরী আবার কেন উজান যেতে চায়।' এই গানটি লিখেছেন রাতে। দেখা গেল তখনো তার বয়ান বা সুরারোপ সম্পূর্ণ হয় নি, আমাকে শেখাতে শেখাতেই বাকিটা ঠিক করে নিলেন। পকেট থেকে কলম বেরুলো, কাটাকুটি কাগজ বেরুলো, গলা থেকে সুর বেরুলো, গানে সম্পুর্ণতা এলো। দিন তিনেক বাদে আর একটি গান তৈরী হলো, 'এতো জল ও কাজল চোখে পাষাণী আনলে বল কে'।

যখন গানে বসতেন অবিশ্রান্ত চা খেতেন বলে আমার মা মাঝে মাঝেই অপ্রত্যাশিত ভাবে এক কাপ চা এনে দিতেন হাতে, আহলাদে আটখান হয়ে উঠতেন "নাহ্ মার মতো মেয়ে হয় না।' সেদিন গেয়ে উঠলেন এতো চা ঐ পেয়ালায় আনলে বলো কে।' এইটুকু থেকেই পরের দিন ঐ গান রচিত হয়ে এল। 'শেখো, শেখো, শিগির শিখে নাও।' এসেছিলেন মাত্রই কয়েক দিনের জন্য, রইলেন প্রায় মাস দেড়েক। উঠেছেন বর্ধমান হাউসে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনের বাড়ী। সেখান থেকে রোজ আসতেন ঘোড়ার গাড়ি করে। দূর তো কম নয়, কোথায় রমনা আর কোথায় বনগ্রাম। যদি গাড়ী না মিলতো তাহলে হেঁটে। গান গুন গুন করেই হাঁটতেন। বলতেন কখন পথ ফুরিয়ে গেল বুঝতেই পারলাম না।" (প্রতিভা বসু, নজরুল ইসলাম, দেশ, সাপ্তাহিক কলকাতা ২৪ মে ১৯৮০ সংখ্যা পৃষ্ঠা-১৭-১৯)

অসাধারণ একটি চিত্র নজরুল সম্বন্ধে। রানু সোম যে কি দারুণ শ্রদ্ধা করতেন নজরুলকে তা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এই চিঠির অংশবিশেষের মধ্যে। এর মধ্যে ভালবাসা, তাও কি ছিল না। নজরুল ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে আবার ঢাকায় এসেছিলেন। স্মৃতিচরণে ড. কাজী মোতাহার হোসেন বলেন:

"আমি তখন বর্ধমান হাউসের হাউস টিউটর হিসেবে উক্ত ভবনের দোতালায় বাস করতাম। নজরুল ইসলাম সেবার আমার সঙ্গে মাসাধিককাল ছিলেন। ---- একেবারে বনগাঁর অধিবাসী প্রতিভা সোম ওরফে রানু সোম (বর্তমানে বুদ্ধদেব বসুর স্ত্রী) এবং রমনা হাউসের অধিবাসিনী উমা মিত্র ওরফে নোটন (ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সুরেন্দ্র মিত্রের কন্যা) এই দুইজনের সঙ্গে কবির বিশেষ পরিচয় হয়। রানু ও নোটন দুজনেরই পিতা-মাতা ও পরিবারবর্গের সঙ্গে আমার ও আমার পরিবারবর্গের সবিশেষ পরিচয়

ছিল। রানুর কণ্ঠস্বর মিষ্ট ও সুরেলা ছিল। নজরুল একে গান শুনিয়ে আনন্দ পেতেন। তিনি কল্যানীয়া বীণাকণ্ঠী শ্রীমতি প্রতিভা সোম জয়জুক্তাসু' নামে তাঁর 'চোখের চাতক' উৎসর্গ করেছিলেন। রানুকে গান শেখাবার পেছনে কবির আর একটা উদ্দেশ্য ছিল, দিলীপ রায়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা। দিলীপ রায় ইতিপূর্বে টিকাটুলির অধিবাসিনী রেনুকা সেনকে গান শিখিয়েছিলেন।----- নজরুল চেয়েছিলেন রানুকে দিয়ে দিলীপের সাগরেদ রেনুকার চেয়েও উৎকৃষ্ট ও উচ্চাঙ্গের রেকর্ড সংগীত গাওয়াবেন। প্রকৃতপক্ষে নজরুলের এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল।

----- প্রিন্সিপ্যাল মৈত্রের মেয়ে নোটন ছিল অপরূপ সুন্দরী। দিলীপ রায় ঢাকায় এসে প্রধানত প্রফেসর সত্যেন বোসের বাড়ীতেই উঠতেন। ইনি সেখানে এবং প্রফেসর বোসের বন্ধুদের বাড়িতেও গানের আসরে নিয়ন্ত্রিত হয়ে গান গাইতেন। ----- তবে কণ্ঠ সংগীতে নোটনের তেমন অনুরাগ ছিল না। সে ছিল চিত্রশিল্পী ও সেতারী। বিখ্যাত সেতার শিল্পী হায়দর আলীর কাছে তার সেতার শিক্ষা বিকশিত হয়। তাই দিলীপ রায়ের বা নজরুলের গানের সঙ্গে নোটন সেতারের সঙ্গত করতেন। এর বাপ-মা দুজনেই কিছুটা বিলাতী ধরনের ব্রাহ্ম ছিলেন। ------ নজরুল এই পরিবারের একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। আমি অনেকবার শুনেছি নজরুল কী গভীর আবেগে মীড়, মুর্ছনা প্রভৃতি অলঙ্কারকে ভাবের সঙ্গে সংগতি রেখে রাগ থেকে রাগান্তরে গিয়ে আবার পূর্ব রাগে ফিরে আসতেন। ভিতরের প্রবল আবেগ বাইরে সুরের নব নব প্রকাশে নিপুণভাবে বিকশিত হতো– শুনে অবাক লাগতো। নজরুল ইসলামের 'নিশি ভোর হল জাগিয়া– পরানপিয়া' 'আজি এ কুসুম হার সহি কেমনে?' 'বসিয়া বিজনে' কেন একা মনে ' প্রভৃতি বহু গানের সঙ্গে নোটন সেতারের সঙ্গত করেছেন। সে সময় সস্ত্রীক মৈত্র মশায়, সত্যেন বাবু এবং আমিও সেদিন এঁদের সংগীতালাপ উপভোগ করেছি। নজরুলের চক্রবাক গ্রন্থখানা নোটনের নামে নয়, নোটনের বাবা 'বিরাট প্রাণ কবি দরদী প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র শ্রীচরণার বিন্দেযু'র উৎসর্গ করা হয়েছিল।

আমি জানি নোটনের কাছ থেকে নজরুলের প্রতি কোন প্রকার বাহ্য পক্ষপাতিত্ব, সাড়া, অনুরাগ বা বিরাগ লক্ষ্য করা যায়নি। তাইতো মনে হয় 'চক্রবাক' এর অনেক কবিতায় যে হতাশার সুর, অভিমানী কবির হৃদয় উৎসারিত হয়েছে, তা প্রত্যক্ষ কোন ব্যক্তিবিশেষে প্রতি লক্ষ্য করেই হয়েছে বলে মনে হলেও খুব সম্ভবত তাতে কবি নজরুলের মনের নানা মিশ্র ঘটনার স্মৃতির একটা সমবেত ছাপ পড়েছে।' (কাজী মোতাহার হোসেন, স্মৃতিচিত্র, "তোমার সাম্রাজ্যে যুবরাজ" হায়াৎ মামুদ ও জ্যোতি প্রকাশ দত্ত সম্পাদিত, ঢাকা, সাহিত্যিকা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮০, পৃষ্ঠা ১০৪-১০৬)

প্রতিভা বসু ওরফে রানু সোম নজরুল সম্বন্ধে যা বলেছেন তা বাস্তব সত্য। নজরুল তাঁর সমকালে যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন তা প্রতিভা বসুর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট। তিনি নজরুলকে কখনও আগে দেখেন নি কিন্তু তাঁর গান শুনেছেন। তাঁর পরিবারের সকলেই নজরুলকে পেয়ে অভিভূত হয়েছিলেন। নজরুল তাঁদের পরিবারেরই একজন

হয়ে পড়েছিলেন। নজরুল কেন প্রতিভা বসুদের বাড়ীতে যেতেন সে সম্বন্ধে কাজী মোতাহার হোসেন বলেছেন। নজরুল সে সময় বিবাহিত এবং পুত্র সন্তানের পিতা। সুতরাং ফজিলাতুন্নেছা বা নার্গিস বেগমের মত প্রতিভা সোম (বসু), যিনি নজরুল থেকে অনেক রূপে ছোট ছিলেন, তাঁর সাথে কোন প্রেম নিবেদনের বিষয়টি প্রত্যক্ষ ভাবে আসতে পারে না। কিন্তু কবিদের মন বুঝা ভার। তাঁর প্রতিভা সোমের প্রতি তাঁর যে আর্কষণ ছিল এবং প্রতিভাও যে তাঁর প্রতি 'আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন এমন ধারণা সে সময়ে অমূলক ছিল না। আমরা জেনেছি বুদ্ধদেব বসু এক সময় নজরুলকে নিয়ে হৈ চৈ করেছেন। নজরুল ছিলেন সে সময় তরুণ কবিদের মধ্যমণি। নজরুল ঢাকায় এলে বুদ্ধদেব বসু এবং তাঁর বন্ধু কবিজনেরা তাঁকে ঘিরে সাহিত্য আলোচনা করেছেন, গানের আয়োজন করেছেন এবং সেসব স্থানে নজরুল ছিলেন সকলের আকর্ষণের পাত্র। কিন্তু পরবর্তীতে বুদ্ধদেব নজরুলের প্রতি দারুণ বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে পড়েন এমনকি তাঁর এও বলতে বাঁধেনি যে তিনি আদৌ কোন কবি নন। বুদ্ধদেব বসু পুরোন পল্টনের অধিবাসী ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের কৃতি ছাত্র ছিলেন।

প্রতিভা সোমের সঙ্গে তাঁর বিয়ের আলোচনাও চলছে। এমনি সময়ে নজরুলকে প্রতিভা সোমের বাড়ীর একেবারে কাছের ছেলেরা নজরুলের বিরুদ্ধে এমন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠার কারণ কি ?

নজরুল তো ঢাকায় বিভিন্ন স্থানে গান শুনিয়েছেন। অনেকের বাড়ীতেও তাঁর যাতায়াত ছিল। কোথাও নজরুলকে নিয়ে কোন বিপদ ঘটেনি। একজন মুসলমান যিনি একান্ত করেই অসাম্প্রদায়িক এবং ঢাকায় তাঁর নাম-ডাক হয়েছে এমন অবস্থায় তাঁকে তারা কেন মারতে চাইল?

প্রতিভা সোম (বসু) নজরুলের সঙ্গে তাঁর গ্রাম দেখার কথা বলেছেন। কিভাবে তিনি আবেগ-আপ্লুত হয়েছিলেন সে বিষয়েও তাঁর লেখা থেকে আমরা জেনেছি। নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে তাঁর সেই প্রথম দেখার চমৎকার দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হল :

"আমি না দেখেই নজরুল ইসলাম বলে মনে করতে পারলাম তার একটা কারণ ছিল। ঝাপসা ঝাপসা শুনেছি নজরুল ইসলাম নাকি ঢাকায় এসেছেন। ঠিক খবর কেউ বলতে পারছিল না। নজরুল ইসলামের গানে তখন সারা দেশ পাগল। যার কোন সুর নেই সেও মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে আবেগ সহকারে 'কে বিদেশী বন-ওদাসী' টানে। তাছাড়া একটা লড়াই ফেরতা লোক তো বটে। বিপ্লবাত্মক বক্তৃতা দিয়ে ফাটিয়ে দিচ্ছেন, দেশ; ছেলেরা উদ্বুদ্ধ হয়ে 'দুর্গম গিরিও কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে' গাইতে গাইতে জেলের ফটকে ঢুকছে। প্রেমের গান গেয়ে আমিও রাতারাতি এতো নাম কিনে ফেলেছি যে ভক্ত সংখ্যা প্রায় অগনন।"

প্রতিভা বসু 'দেশ' পত্রিকায় যে লেখাটি নজরুল সম্বন্ধে লিখেছিলেন তা আরও একটু মার্জিত করে–১৪০০ সালের বৈশাখ (১৯৯৩ এর এপ্রিল) প্রকাশিত 'জীবনের

জলচ্ছবি' গ্রন্থে নজরুলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় এবং তাদের পরিবারের সঙ্গে নজরুলের ঘনিষ্ঠ মেলামেশা ইত্যাদির বর্ণনা দিয়েছেন।

এ সম্পর্কে শাহাবুদ্দীন আহমেদ তাঁর 'নজরুল জীবন ও কবিতায়' গ্রন্থে প্রতিভা বসুর নজরুল সম্বন্ধে লেখা সম্বন্ধে বলেন :

"প্রতিভা বসুর এই লেখা দেখেই বোঝা যায় নজরুলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় নিবিড় হয়েছিল। শুধু এই নয় তাদের এই গুরু-শিষ্য সম্বন্ধকে কেন্দ্র করে অশালীন গুজবের উৎপত্তি হয়েছিল। এই ঘটনার কথা ঢাকায় বন্দি থাকে নি তা চলে গিয়েছিল কলকাতায়। এই পরিচয়কে উপলক্ষ করে সজনীকান্ত দাস নজরুলের বিখ্যাত গান "কে বিদেশী বন-ওদাসী বাঁশের বাঁশি বাজাও বনে" গানের প্যারোডি করে লেখেন– 'কে, ওদাসী বনগাবাসী বাঁশের বাঁশি বাজাও বনে। বাঁশী সোহাগে ভিরমী লাগে বর ভুলে যায় বিয়ের কনে।'

এই প্যারোডি গানে বুদ্ধদেব বসুর প্রতি কোন ইংগিত দেওয়া হয়েছে কি না এমন চিন্তাকে মনে উদয় হতে পারে তা অস্বাভাবিক নয়।'

শাহাবুদ্দীন আহমদ বলেন, "অবস্থা এমন গড়িয়েছিল যে ঢাকার বনগ্রামের কিছু হিন্দু ছেলে রাত্রিতে প্রতিভা বসুদের বাড়ী থেকে ফেরার পথে নজরুলকে লাঠিসোটা নিয়ে আহত কিংবা নিহত করার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করে।"

এ প্রসঙ্গে রানু সোম লেখেন :

"সে বারে ঢাকা গিয়ে নজরুল ইসলাম যেদিন ঢাকা ছেড়ে ফিরে গেলেন, তার দুদিন আগে সন্ধ্যেবেলা আমাদের বাড়ীতে তাঁর গান আর আবৃত্তির একটা আসর বসেছিল। আসর ভাঙতে সামান্য দেরী হলো। সকলে চলে গেলে মা নজরুলকে খেতে দিলেন। রাত দশটা বেজে গেলো। বাবা বললেন, আপনি অপেক্ষা করুন, আমি সাইকেল নিয়ে গিয়ে একটা গাড়ী ডেকে আনি।' তিনি বললেন, 'পাগল নাকি ? আপনি গিয়ে আমার জন্যে গাড়ী ডেকে নিয়ে আসবেন? সে কখনো হয়?

বাবা বললেন, 'পাড়াটা দেখছেন তো এইটুকু রাত্রিতেই কেমন থমথমে চুপচাপ হয়ে যায়।'

এখন কাছে পিঠে কোন গাড়ী পাওয়ার সম্ভাবনাই নেই, বড় রাস্তার মোড়ে একটা ঘোড়ার গাড়ীর আস্তাবল আছে, ভাড়া বেশী দিলে চলে আসবে।'

নজরুল হেসে খুন, 'আমার কি রানুর মত ভুতের ভয় আছে না কি যে রাত বেশী হয়েছে বলে, পাড়া চুপ হয়ে গেছে বলে হেঁটে যেতে ভয় পাবো ? গানের কলি গাইতে গাইতে নেমে গেলেন রাস্তায়।

মা দোতলায় এসে বিছানা পাততে পাততে বাবাকে বললেন, 'জান আজ ও বাড়িতে' এই বলে ইঙ্গিতে পাশের বাড়িটা দেখিয়ে দিলেন, (অর্থাৎ তাঁর প্রিত্রালয়ের

পরশ্রীকাতর বাড়িটা) সারাদিন ধরে কী যে পরামর্শ চলছিল, কে জানে, কেবল বারান্দায় এসে এসে কয়েকটা ছেলে আমাদের বাড়ীটা দেখছিলো, দেখলাম পাড়ার গুন্ডার সর্দার সেই অমুক সাহাটা।

যখন দিলীপ দা এসেছিলেন তখন ওরা একদিন দিলীপ দাকে নিজের মেয়েদের গান শেখাবার জন্য নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, দিলীপ দা সেই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তারপর থেকে ও বাড়ীর সর্বময়ী কত্রী বয়স্ক সুন্দরী আত্মীয়টি আর আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা এবং কন্যাদেরও বলতে দিতেন না। অতি পাশাপাশি বাড়ী, চোখাচখি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনায় বারান্দায় একটি চটও ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। বাবা বলছিলেন, 'বেশ হলো। তোর মায়ের পিত্রালয়ের আত্মীয় প্রীতিটি একটু কমবে এবার।'

আমার বাবা ওদের ধরণ ধারণ কথাবার্তা জীবন-যাপন প্রণালী কিছুই বিশেষ পছন্দ করতেন না।

মায়ের কথা শুনে বাবা বললেন, 'ঐ গানটান হচ্ছিল তো, লোকজন এসেছিল, ওদের বলা হয়নি, তাই উঁকিঝুঁকি মেরে দেখছিল।'

বলতে বলতে নি:শব্দ পাড়া ভেদ করে একটা কোলাহল ভেসে এল। সঙ্গে সঙ্গে মা ব্যাকুল হয়ে বললেন, আমার মনে হচ্ছে নজরুলকে আজ ওরা কিছু করবে, আমি দেখেছি নজরুল বেরুলো, আর ওদের বাড়ী থেকেও বেরিয়ে পড়ল কয়েকটি ছেলে।

বাবা গেঞ্জির গায়েই দৌড়ে নীচে নেমে গেলেন, চটি পায়েই দরজা খুলে ছুটলেন। আমি আর মা উৎকণ্ঠিত উদ্বেগে ঝোলানো বারান্দায় যতদূর চোখ চলে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

খানিকক্ষণ পরেই দেখতে পেলাম বাবা আর নজরুল হেঁটে হেঁটে আসছেন। বাবা নজরুলকে ধরে ধরে আনছেন।

মায়ের মনে যে আশংকা দেখা দিয়েছিল সেটাই ঘটেছে। নজরুল যখন বনগ্রামের মোড় পেরিয়ে একটা আরো নির্জন রাস্তায় পৌঁছেছেন, বোধ হয় সেটা ঠাঁটারি বাজারের মোড়, সেই মুখটাতে যেতেই ছয়-সাত আই ছেলে লাঠি দিয়ে পিছন থেকে প্রচন্ড আঘাত করতে করতে বললো, দিলীপ রায়ের টাক ফাটাতে পারি নি, এবার তোর বাবরী চুলের মাথাটা আর আস্ত রাখবো না।

নজরুল আচমকা আঘাত পেয়ে মুহূর্তের জন্য বিহবল হয়ে গিয়েছিলেন বটে, পরক্ষণেই ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা ছেলেকে ধরে ফেলে তার হাতের লাঠি নিয়েই তাকে ধরাশায়ী করে সমানে সেই লাঠি বন বন করে ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন, 'কে আসবি আয় কটা আসবি আয়।' লাঠিখেলা ছোরা খেলায় দক্ষ মেরুদন্ড সিধে একটা যুদ্ধ ফেরতা মানুষের সন্ধ্যায় এই শৃগাল শুকরের দল কি দাঁড়াতে পারে? তবু যতক্ষণ ঐ ছেলেটাকে পিটিয়ে হাতের সুখ করেছেন ততক্ষণে এরাও এলোপাথাড়ি যে যে ভাবে পারে মেরেছে

তাঁকে। তারপর লাঠি ঘোরানো দেখে মাটিতে পড়ে থাকা ছেলেটাকে তুলে নিয়ে পালিয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেছে ব্যাপারটা। বাবা গিয়ে যখন পৌঁছেছেন তখন লাঠি ঘোড়াতে ঘোড়াতেই পাইদল নজরুল। বর্ধমান হাউসে যাবেন।

'নজরুল, আমি।'– বাবার গলা পেয়ে থেমে গেলেন তিনি, বাবা তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন, কোথায় যাচ্ছেন? আমার সঙ্গে চলুন।'

নজরুল হেসে বললেন, 'আপনার বাড়ী যাই বলে ওরা আমাকে মেরেছে, রানুকে নিয়ে অনেক কুৎসিত কথা বলেছে, এখন যদি আবার ওখানে যাই, এই শুকর সন্তানগুলো তো বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেবে। আপনি কেন এলেন? কী সাহসে এলেন? ওরা কোথায় লুকিয়ে আছে ঠিক নেই, আপনাকে গুম করে ফেলবে ওরা। আমি ওদের সঙ্গে খুঁজতে পারব আপনি মারবেন না।'

বাবা বললেন, 'পারি না পারি সেটা আমি দেখবো। আমি আপনাকে ছেড়ে যাব না।'

'আমিও আপনার সঙ্গে যাবো না। রাত দশটা পর্যন্ত থেকেছি বলেই যে–সব জঘন্য ভাষা প্রয়োগ করেছে, সারা রাত থাকলে কি উপায় রাখবে? না, না আপনি ফিরে যান আমি যাবো না।' বাবা জোর করে ধরে নিয়ে এলেন। কী করে কী দুরন্ত সাহসে যে উনি অতদূর হেঁটে চলে যাচ্ছিলেন তা উনিই জানেন।

বাড়ীতে এনে বাবা বিছানায় শুইয়ে দিলেন, মা লন্টন কাছে নিয়ে কোথাও জখম হয়েছে কিনা দেখার জন্য ঝুঁকে পড়ে শিহরিত হলেন। হাতে পায়ে মাথায় পিঠে সর্বত্র গভীর আঘাতের চিহ্ন মোটা মোটা হয়ে রক্ত জমাট হয়ে ফুলে উঠছে। কী করে সেই রাতটা আমরা কাটিয়ে ছিলাম, আমরাই জানি। মা ওকে হোমিওপ্যাথি ঔষুধ খাইয়ে দিলেন, আমাদের পরিচারিকা পুনার মা, যে ওকে কালোকৃষ্ণ বলেছিল, সে চোখ মুছতে মুছতে সমস্ত আহত জায়গা নারিকেল তেল দিয়ে ভিজিয়ে দিল, মা বাতাস করতে লাগলেন, আমি আর বাবা প্রায় অচেতনের মত মেঝেতে বসে রইলাম। রাত ভোর হয়ে গেল।

তার মধ্যে অবশ্য ঠাট্টা তামাসা করে আমাদের ভারী মন হাল্কা করার চেষ্টা করছিলেন। ফলশ্রুতি অশ্রুর বন্যা। লজ্জা, দুঃখ, অসম্মান কী না নিহিত ছিল তার মধ্যে।"

সাধারণ একটি মর্মস্পর্শী বিবরণী। লেখাটির মধ্যে যে দারুণ ভালবাসা ও প্রীতিময়তা রয়েছে পাঠক মাত্রেই তা বুঝতে সক্ষম হবেন। প্রতিভা বসু (সোম) বিবাহের আগে যে নজরুলকে তাঁর মনকে সঁপেছিলে এটা বোঝা যায়। কিন্তু একথা নজরুল জানতেন না। প্রতিভাবসু (সোম) ওরফে রানু সোম নিজের মধ্যেই তা রেখে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অন্তরে ছিল নজরুলের প্রতি পবিত্র অথচ অদম্য ভালবাসা। নজরুল রানু সোমদের বাড়ীতে বারবার গিয়েছেন, শুধু যে রানু সোমকে গান শেখাবার

জন্য, কিংবা তাঁর গানের শ্রেষ্ঠ গায়িকায় পরিণত করার জন্য, বোধহয় তা না। এখানে তিনি মায়ের স্নেহ পেয়েছেন যে স্নেহের জন্য তিনি কাঙ্গাল ছিলেন। সর্বোপরি তিনি একটি মেয়ের ভালবাসা পেয়েছিলেন। সামাজিকতা হয়তো তাঁদের কাছে আসতে দেয়নি। অন্যকে তিনি যেমন ভালবাসার কথা মুখ ফুটে বলেছেন, এখানে তা করেন নি। নোটনের (প্রিন্সিপ্যাল সুরেন্দ্র মৈত্রের কন্যা) অর্থাৎ উমা চন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সংগীতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাঁকে নিয়েও কথা উঠেছিল। কিন্তু নজরুল এবং রানু উভয়ে উভয়ের প্রতি যে অনুরক্ত ছিলেন তা বেশ বোঝা যায়। এখানেই নজরুলের প্রেম ব্যতিক্রমধর্মী। এ কারণে হয় তোবা বুদ্ধদেব বসু নজরুলের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে পড়েন। নজরুলের ওপর যে আঘাত এসেছিল তাতে যুদ্ধদেব বসুর উস্কানি থাকাটা একেবারে অমূলক নয়।

প্রতিভা অর্থাৎ রানু সোম নজরুলকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। এই দেখাটা সাধারণ ছিল না। বেশ বোঝা যায় তাঁর সে দৃষ্টিটা ছিল ভালবাসার। নজরুলের সব কিছু তাঁর ভালো লাগতো। তাঁর কোন খারাপ কিছু হোক, এসকল তিনি বুঝতেন না। আবার কোন ক্ষেত্রে তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভা দেখলে তিনি তা মুগ্ধ নয়নে চেয়ে চেয়ে দেখতেন।

প্রতিভা বসু তাঁর প্রবন্ধে লেখেন: "নজরুল ইসলাম অন্ধকারেও চোখে দেখতে পেতেন। এই ক্ষমতা তাঁর জেলের 'সেলে' আবদ্ধ থাকার সময় আয়ত্ত হয়। অন্ধকারে ঠিক বই পড়তে পারতেন কিনা জানি না তবে লিখতে কোন অসুবিধা হতো না। এই কীর্তনটি তিনি রাত জেগে অন্ধকারে বসেই লিখেছিলেন। আমাদের চুঁচড়ার বাড়ীতে বিদ্যুৎ ছিল না। ঘুমের আগে সব আলো নিভিয়ে শোওয়া হতো। রাস্তায়ও বিদ্যুৎ ছিল না, দূরে দূরে গ্যাসপোষ্ট থাকতো; তার আলো খুব নরম। কাজেই ঘরের আলো নিভে গেলে ঘোর অন্ধকারে ছেয়ে যেতো চার দেওয়ালের পৃথিবী। সেই অন্ধকারে তিনি কী করে অসমাপ্ত লাইন সমানভাবে সাজিয়ে লিখতে পারতেন ভেবে অবাক হতাম। শুধু ঐ কীর্তনই নয়, আমাদের কাছে থাকাকালীন বহু গান তিনি রাত্রি নিঃশব্দ হলে, সবাই ঘুমিয়ে পড়লে নির্জন অন্ধকারে বসে সুর করে লিখেছেন।"

নজরুলের এই অসাধারণ ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করে প্রতিভা বসু অবাক হতেন– এবং অবাক হবারই কথা। সকলে ঘুমিয়ে গেলে তিনি ঘুমোতে পারতেন না– কেন? এর মধ্যে কি কোন প্রীতিময়তা, সহমর্মিতা কিংবা নিরব ভালবাসার দিকটা ফুঠে ওঠে না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় একেই তো ভালবাসা কয়।' প্রতিভা বসু আরও লেখেন ঃ

'আমাদের পরিচারিকা নজরুলকে দেখে বলেছিলেন, 'ওমা এ যে একেবারে কালো কৃষ্ণ গো।' সেটা সোনার পর থেকে পিসিমা সব সময়েই কালো কৃষ্ণ বলে ঠাট্টা করতেন। উনিও পিসিমাকে খাঁদানাক বলে খ্যাপাতেন। পিসিমা জবাবে বলতেন তা যাই বলো– বাপু, খাঁদাই হই আর যাই হই, রং খানা তো তোমার চেয়ে গোরা।' হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলতেন, 'নাও মেলাও, পরখ করে দেখো একবার।'

একদিন নজরুল বললেন, 'নাহ কালো রূপের যে কত গুণ সেটা আর না দেখালে নয়।' সেই রাত্রেই কীর্তনের সুরে এই গানটি লিখলেন–

"কেন ভ্রান্ত হয়ে ওঠে কাঁদিয়া
কাদিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া গো।
আমি যত ভুলি ভুলি করি
তত আঁকড়িয়া ধরি
তত মরি সাধিয়া সাধিয়া সাধিয়া গো।
শ্যামের সেরূপ ভোলা কি যায়
আমার বধূর রূপের ছায়া বুকে ধরি,
আকাশ আরশি নীল গো,
বহে ভুবন প্লাবিয়া কালারে ভাবিয়া
কালো সখার সলিল গো।
যদি ফুল হয়ে ফুটি তরুশাকে
সে যে পল্লব হয়ে ঘিরে থাকে।
যদি একাকিনী চলি বনতলে
সে যে ছায়া হয়ে পিছে পিছে চলে।'

এমন ঘনষ্ঠভাবে যিনি দেখতে পেতেন, তাঁর অন্তরে কি কোন প্রতিক্রিয়া হতো না! পাড়ার ছেলেরা তা বুঝেই একজন 'মোচলমান'কে তাড়াতে চেয়েছিল হিন্দু সমাজকে রক্ষা করার জন্যে। প্রতিভা যে সেদিন নিরবে কেঁদেছিলেন তাঁর লেখাতে তো তা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রতিভা বসু (রানু সোম) সেদিনের যে ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে বোঝা যায় যে নজরুল তাঁর ওপর আক্রমণ হবার পর আহত হয়ে প্রতিভা বসুদের বাড়ীতেই রাত্রি যাপন করেছিলেন। কিন্তু ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন এ ঘটনা সম্বন্ধে লেখেন:

"একদিন রাত্রি ১১টা পর্যন্ত আমাদের অতিথি নজরুল ইসলামের জন্য আমরা বর্ধমান হাউসে অপেক্ষা করছিলাম। আরও আধঘণ্টা খানেক পর আমরা সিঁড়িতে দ্রুত মনুষ্য পদধ্বনি শুনতে পেয়ে বেরিয়ে এলাম। দেখলাম নজরুল ইসলাম তাঁর ঘরে ঢুকছেন--হাতে তাঁর একটি নতুন লাঠি। গায়ের পাঞ্জাবীতে রক্তের ছাপ এবং শরীরে লাঠির আঘাতের চিহ্ন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর এবং কোন রকমে ক্ষতস্থান পট্টি আদি লাগানোর পর তাঁর কাছ থেকে নিম্নোক্ত ঘটনা শোনা গেল:-

"সোম মশায়ের বাড়ী থেকে আমি কেবল বেরিয়ে পথে নেমেছি; এমন সময় ৭/৮ জনের একটি যুবকের দল দড়ি ও লাঠি নিয়ে আমাকে চারদিক থেকে আক্রমণ করল। প্রথমটা আমি হকচকিয়ে গেলাম কিন্তু পর মুহূর্তেই একজনের হাত থেকে ফিরিয়ে দিতে

হয় তা একটু তাঁদের বুঝিয়ে দিলাম। আমার কাছাকাছি যে দু'তিনজন ছিল এ হায়দারী ঘায়ের দু'চারটা খেয়েই সেখানে লুটিয়ে পড়ল। অবস্থা বেগতিক দেখে এবং কাছের মোড়ের পাহারাদার পুলিশের আগমন ভয়ে তারা সব দ্রুত পালিয়ে গেল।'

মোতাহার হোসেন এ প্রসঙ্গে আরো বলেন : 'ঘটনাটি ঘটেছিল বনগ্রাম লেনে। এই গলির ওপরেই ছিল সোম মশায়ের বাড়ী। স্থানীয় হিন্দু যুবকেরা সজনী কান্তর প্যারোডিটি সম্ভবত: পড়েছিল। এতে তাদের মনে সন্দেহ দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। তারা একটা কেলেঙ্কারির কথা আঁচ করে তার একটা বিহিত করার চেষ্টা করছিলেন। রানু হিন্দুর মেয়ে আর নজরুল মুসলমানের ছেলে। সুতরাং তাদের হিন্দু রক্ত এই সম্পর্কটিকে একেবারেই সহ্য করতে পারছিল না। এ যেন ছিল তাদের পৌরুষের ওপর আঘাত।"

কাজী মোতাহার হোসেন যে বর্ণনা দিলেন তারা সঙ্গে প্রতিভা বসুর লেখার সঙ্গে মিল নেই। নজরুল সে রাতে বর্ধমান হাউসে ফিরে আসেন নি। মোতাহার হোসেন স্মৃতি থেকে লিখতে গিয়ে ভুল করেছিলেন। হয়তো সেদিন সকালেই আহত অবস্থায় তিনি নজরুলকে বর্ধমান হাউসে দেখেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে শাহাবুদ্দীন আহমদ তাঁর গ্রন্থে প্রতিভা বসুর একটি বিস্তারিত লেখার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন :

'প্রতিভা বসুর এই লেখা দেখেই বোঝা যায় নজরুলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় নিবিড় হয়েছিল। শুধু এই নয়, তাঁদের এই গুরুশিষ্য সমন্ধকে কেন্দ্র করে অশালীন গুজবের উৎপত্তি হয়েছিল। এই ঘটনার কথা ঢাকায় বন্দী থাকেনি তা চলে গিয়েছিল কলকাতায়। এই পরিচয়কে উপলক্ষ করে সজনী কান্ত দাস নজরুলের বিখ্যাত গান– "কে বিদেশী বন ওদাসী বাঁশের বাঁশি বাজাও বনে' গানের প্যারোডি করে লেখেন– কে উদাসী বনগাঁ বাসী বাঁশের বাঁশি বাজাও বনে। বাঁশি সোহাগে ভিরমী লাগে বর ভুলে যায় বিয়ের কনে।' অবস্থা এমন গড়িয়েছিল যে ঢাকার বনগ্রামের কিছু হিন্দু ছেলে রাত্রিতে প্রতিভা বসুদের বাড়ী থেকে ফেরার পথে নজরুলকে লাঠিসোটা নিয়ে আহত কিংবা নিহত করার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করে। ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন লিখেছেন– "এ প্রসঙ্গে আর একটা কথা উল্লেখযোগ্য। সে হচ্ছে আমাদের দেশের লোকের মনোবৃত্তি। দিলীপ রায়ের সঙ্গে রেণুকার সম্পর্কের বিকৃত অর্থ করে কলকাতার সাহিত্যিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা দিলীপ রায়ের নাম দিয়েছিলেন 'কাণু রে!' আর রাণুর সঙ্গে নজরুলের সম্পর্কের বিকৃত অর্থ করে সজনী কান্তের শনিবারের চিঠিতে বেরিয়েছিল, 'কে উদাসী বনগাঁ বাসী বাঁশের বাঁশি (লাঠি) বাজাও বনে।' আর নওজোয়ান হিন্দু ছোকরারা একজন মুসলমান (বা মুসলা) যুবক প্রতিভা সোমকে দিন নেই রাত নেই যখন তখন গান শেখাতে আসবে তা সহজ মনে গ্রহণ করতে পারেনি– হয়ত তাদের কাছে এ ব্যাপারে নিজেদের পৌরুষের ওপর আঘাত বা চ্যালেঞ্জের কথা সব মনে হয়েছে। তাই একদিন রাত দশটা এগারোটার মত সময়ে রাণুদের ঘর থেকে গান শিখিয়ে বেরিয়ে আসবার সময় অন্ধকারে পাঁচ সাতজন

যুবক নজরুলকে লাঠিসোটা নিয়ে আক্রমণ করে। নজরুলও জওয়ান মর্দ মানুষ। বেতের মুঠাওয়ালা একটা লাঠি কেড়ে নিয়ে, তাদেরকেও দু'এক ঘা লাগিয়ে দৌড়ে পালিয়ে আসল বর্ধমান হাউসে। দেখলাম, জামা কাপড় ছিঁড়ে গেছে। হাতে পিঠে রক্ত আর পিটুনীর ছাপ।' (ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, আমার বন্ধু নজরুল : তাঁর গান' নজরুল একাডেমী পত্রিকা ১৩৮১ (১৯৭৪ বিশেষ সংখ্যা সম্পাদক, শাহাবুদ্দীন আহমদ।)

প্রতিভা বসুর বিবরণের সঙ্গে ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেনের লেখার একটা বিশেষ অংশে মিল পাওয়া যায় না। শুধু এটাই নয়, আমার মনে হয়, সে সময় বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে রানু সোমের বিয়ের বিষয়ে হয়তো কথাবার্তা হচ্ছিল; তা না হলে সজনী কান্ত কেন লিখলেন:

কে উদাসী বনগাঁ বাসী
বাঁশের বাঁশি বাজাও বনে,
বাঁশি সোহাগে ভিরমী লাগে
বর ভুলে যায় বিয়ের কনে।'

এখানে কোন ভাবে কি বুদ্ধদেব বসুর সম্পর্কটা আসে না? কারণ বুদ্ধদেব বসু নজরুলের কাব্য-গান ইত্যাদির অসাধারণ ভক্ত ছিলেন। এমনকি 'কাজীদা' তাঁর জীবনের সবটুকু স্থান অধিকার করে রাখতেন। এমন অবস্থা থেকে নজরুলকে 'প্রতিভাবান বালক', যিনি কোন হৈ চৈ করে গেছেন– এমন মন্তব্য তো নিঃসন্দেহে কষ্টদায়ক।

যা হোক, নজরুলের ওপর সেদিন যে আক্রমণ হয়েছিল তা কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি থেকেই যে হয়েছিল তা বোঝার অপেক্ষা রাখে না। দীর্ঘকাল এ দেশে হিন্দু-মুসলমান একত্রে বসবাস করেছে। কিন্তু গ্রামে-গঞ্জে যারা বসবাস করেছে তারা উপলব্ধি করেছে যে সাধারণ হিন্দু সমাজ মুসলমানদের উন্নতি চায়নি। মুসলমানদের স্পর্শ ছিল তাদের জন্য পাপ। এদেশে যত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে প্রায় সব ক্ষেত্রেই হিন্দু সমাজের ভূমিকাই ছিল প্রধান।

নজরুল এই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়েছিলেন। এটাও সত্যি যে সে সময় হিন্দু কবি-সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবিরা তার পাশে এসেছেন। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এবং শৈলজানন্দ প্রমুখ বরেণ্য ব্যক্তিরা নজরুলকে বুকে ধরেছেন। মুসলমানদের মধ্যে মাওলানা আকরাম খাঁ প্রমুখ নজরুলকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিলেন।

নজরুলের কবিতা-গান বাঙালীর এই সাম্প্রদায়িক চেতনার বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। 'বিদ্রোহী' কবিতায় এই সত্যের প্রকাশ ঘটেছে। এখানে 'খোদা' ও 'ভগবান' একদিকে যেমন বৃটিশ রাজ্যের শোষন শাসনের প্রতীক অপরদিকে সম্রাজ্যের অত্যাচার অবিচার এবং সাম্প্রদায়িকতা কলঙ্ক মানুষদের প্রতিভু। নজরুলের সাহিত্য তাই চির অম্লান এবং চিরকালের সাহিত্য হিসেবে বাংলা সাহিত্যে টিকে থাকবে।